কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. মেহতাব খানম

মোহাম্মদ মজিবুর রহমান

মোঃ শাহরিয়ার হায়দার

সুমেরা আহসান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এই শতাব্দীর শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়তই একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনা অনুসারে কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর্ম ও পেশার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ শিক্ষার ধারা নির্ধারণে সক্ষম করে তোলার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা এবং তাদের পেশাগত জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহযোগিতামূলক, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী একটি নতুন প্রজন্ম গঠনে নবপ্রবর্তিত **কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	কর্ম ও মানবিকতা	১–২১
দ্বিতীয়	পারিবারিক কাজ ও পেশা	২২–৩৬
তৃতীয়	শিক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মক্ষেত্রে সফলতা	৩৭–৫২

প্রথম অধ্যায়

কর্ম ও মানবিকতা

এই অধ্যায় পড়ে আমরা শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে জানব। কায়িক ও মেধাশ্রমের গুরুত্ব সম্পর্কেও ধারণা পাব। আরও জানতে পারব কীভাবে আত্মমর্যাদার সাথে কাজ করা যায়। আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা আমাদেরকে কাজে সাহায্য করে। এভাবে আমাদের কাজের মানও বৃদ্ধি পায়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- শ্রমের মর্যাদার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কাজের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কাজের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাশীল, আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল হতে আগ্রহী হব।
- শ্রমের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করব।
- নেতৃত্ব প্রদানের সাথে সাথে নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হব।
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

পাঠ ১ : কায়িক শ্রমের গুরুত্ব

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কায়িক শ্রম কী? কায়িক শ্রম হলো শারীরিক পরিশ্রম। আমরা প্রতিদিন নানা কাজ করে থাকি। এসব কাজ করতে আমাদের শারীরিক পরিশ্রম হয় অর্থাৎ এসব কাজের ক্ষেত্রে আমরা কায়িক শ্রম দিয়ে থাকি।

অনেকে কায়িক শ্রম দিয়ে টাকা রোজগার করে থাকে। যেমন-রিকশাচালক, ভ্যানচালক। তোমরা নিশ্চয়ই রিকশা দেখেছো - রিকশাচালক আরোহীদের নানা স্থানে পৌঁছে দেন। রিকশা চালানো কায়িক শ্রমের একটি উদাহরণ। এছাড়াও আরও অনেক কাজ আছে যেসব কাজে আমাদের কায়িক শ্রম দিতে হয়।

> **কাজ**
>
> কায়িক শ্রম প্রয়োজন হয় এমন আরও ৫টি উদাহরণ নিজের খাতায় লিখ এবং উদাহরণগুলো বন্ধুদের সাথে মিলিয়ে নাও। প্রয়োজনে শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারো।

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো - ফসলের খেতে যারা কাজ করেন তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। যারা ঐ ফসল থেকে আমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদান করেন, তারাও অনেক শারীরিক পরিশ্রম করেন। আমাদের সমাজে নানা পেশার মানুষ রয়েছেন; যেমন- কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে ইত্যাদি। তারা সবাই নিজ নিজ কাজ করেন বলেই আমরা আরামদায়ক জীবন-যাপন করতে পারি।

একবার ভেবে দেখত, কৃষক যদি আমাদের জন্য কষ্ট করে ফসল না ফলাতেন তবে আমরা কী খেয়ে থাকতাম? জেলেরা যদি পরিশ্রম করে আমাদের জন্য মাছ না ধরতেন তাহলে কি আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি হতে পারতাম? তাঁতি ও দর্জিরা যদি আমাদের জন্য পোশাক তৈরি না করতেন তা হলে আমরা কী পরতাম? তোমরা কি কখনো তাঁতির কাপড় বোনা দেখেছো? দেখেছো দর্জি কীভাবে কাপড় সেলাই করেন?

আজকাল আমাদের কায়িক শ্রমের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। এজন্য সহায়তা করছে প্রযুক্তি ও নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ভেবে দেখো, আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে মানুষ কীভাবে দূরের কোনো জায়গায় যেতেন? তাদের হয় পায়ে হেঁটে যেতে হতো না হয় গরু, মহিষ, ঘোড়া,

গাধা ইত্যাদিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে হতো। হাঁটলে আমাদের শারীরিক পরিশ্রম হয়। হাঁটা কায়িক শ্রমের উদাহরণ। জলপথে গেলে হয়ত নৌকা ব্যবহার করতে হতো। নৌকার দাঁড় টানতে এবং নৌকা চালাতে কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। অনেক কায়িক শ্রমের কাজ আমাদের হয়ে যন্ত্র করে দিচ্ছে। আজ আমরা বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করে খুব সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারি।

কায়িক শ্রম আমাদের দেহ ও মনের জন্য খুবই জরুরি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত আমরা নানা কাজ করে থাকি। এসব কাজ করতে আমাদের কায়িক শ্রম দিতে হয়। এসব কাজ আমাদেরকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত ও পরিমিত কায়িক শ্রম আমাদেরকে বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা থেকে রক্ষা করে। এ শ্রম শরীরের কার্যক্ষমতা ঠিক রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই জরুরি। আর শুধু নিজেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেই হবে না, আমাদের চারপাশও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আমরা আমাদের বাড়ি ঘর, চারপাশ, বিদ্যালয়, এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখব। বিদ্যালয় চত্বর পরিষ্কার করা কায়িক শ্রমের উদাহরণ। আমাদের কায়িক শ্রমের ফলে চারপাশ এতো ঝকঝকে হয়েছে দেখে আমরা গর্বিত হবো।

পাঠ ২ : কঠোর কায়িক শ্রমের নিদর্শন

আমাদের এই সভ্যতা মানবসমাজের কঠোর কায়িক শ্রমের ফল। লক্ষ লক্ষ মানুষের হাজার বছরের কঠোর পরিশ্রমে আমরা অর্জন করেছি আজকের এই উন্নত মানবসভ্যতা। যুগে যুগে মানুষ এমন অনেক কিছু বানিয়েছে যা কঠোর কায়িক শ্রমের পরিচয় বহন করে। আজ আমরা তেমনি কিছু কীর্তির কথা জানব।

মিসরের পিরামিড

মিসরের পিরামিডের নাম কি শুনেছ? মিসরের এই পিরামিডের কথা পৃথিবীর প্রায় সব লোকেই জানে। প্রাচীনকাল থেকে এসব পিরামিড পৃথিবীব্যাপী

বিখ্যাত ছিল। মিসরের এই পিরামিডের বয়স প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর। পিরামিড তৈরিতে মানুষের যেমন লেগেছে কারিগরি জ্ঞান তেমনি প্রয়োজন হয়েছে কায়িক শ্রমের। শোনা যায় প্রায় এক লক্ষ লোকের বিশ বছর লেগেছে গিজার মহাপিরামিডটি তৈরি করতে। এই পিরামিড তৈরিতে যেসব পাথরখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে তাদের এক একটির ওজন কম করে হলেও কয়েক টন। এসব পাথর আবার বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বহুদূর থেকে। কিছু কিছু পাথর টেনে আনা হয়েছে পাঁচশ কিলোমিটার দূর থেকে। কিছু পাথর নিয়ে আসা হয়েছে নদী পার করে। এসব পাথরের গড়ে ওজন ২৫-৮০ টন অর্থাৎ২৫০০০-৮০০০০ কেজি। আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে কোনো উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া কীভাবে মানুষ এই পিরামিড নির্মাণ করেছে তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার! সন্দেহ নেই কঠোর কায়িক শ্রমের ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

চীনের মহাপ্রাচীর

চীনের মহাপ্রাচীর মানবসভ্যতার অন্যতম কীর্তি যা লক্ষাধিক মানুষের কঠোর কায়িক শ্রমের ফসল। মোঙ্গলদের হাত থেকে চীন সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য চীনারা খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে এই মহাপ্রাচীর নির্মাণ শুরু করে। ৮৮৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মহাপ্রাচীর নির্মাণে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক শতাধিক বছর ধরে বিরামহীন কায়িক শ্রম দিয়ে গেছেন।

আগ্রার তাজমহল

তাজমহলের নাম কে না শুনেছে। সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের স্মরণে এই স্থাপনা নির্মাণ করেন। এই তাজমহল যেমন স্ত্রীর প্রতি সম্রাট শাহজাহানের গভীর ভালোবাসার পরিচয় বহন করে তেমনি স্মরণ করিয়ে দেয় এ কীর্তি নির্মাণে হাজার হাজার মানুষের

২০১৮

কঠোর কায়িক শ্রমের কথা। তাজমহল মার্বেল পাথরের তৈরি যা বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে অনেক দূর থেকে। এসব পাথরকে প্রয়োজন মতো কেটে নকশা অনুযায়ী জায়গা মতো স্থাপন করা সহজ কোনো ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া এর অসাধারণ স্থাপত্য শৈলী, বিশাল নির্মাণযজ্ঞ, শত শত বছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়িয়ে টিকে আছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে কঠোর কায়িক শ্রমের ফলে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সে সময় আজকের মতো এত উন্নত প্রযুক্তি ছিল না।

পাঠ ৩ ও ৪ : কায়িক শ্রমের গল্প

আমরা সমাজে বাস করি। এই সমাজে আছে নানা পেশার মানুষ। কেউ শারীরিক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করেন কেউবা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করে উপার্জন করে থাকেন। আমাদের চারপাশেই রয়েছেন এরকম হাজারো মানুষ। চল আজ আমরা কায়িক শ্রমে নিয়োজিত এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে তাঁর জীবনের কথা শুনব।

কাজ

প্রথম পর্ব

শিক্ষক কায়িক শ্রমে নিয়োজিত একজন ব্যক্তিকে অতিথি হিসেবে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসবেন। কায়িক শ্রমে নিয়োজিত ব্যক্তি হতে পারেন-

- একজন রিকশাচালক বা ভ্যানচালক
- ইট ভাঙ্গা শ্রমিক বা নির্মাণশ্রমিক
- খেতমজুর কিংবা দিনমজুর
- কায়িক শ্রমে নিযুক্ত অন্য কেউ

শিক্ষার্থীরা তার কাছ থেকে তার জীবনের কথা শুনবে। তিনি কী কাজ করেন, কী খাওয়া-দাওয়া করেন, কোথায় থাকেন, কীভাবে এই কাজে এলেন, তার স্বপ্ন কী ইত্যাদি বিষয় শুনবে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা কায়িক শ্রমে নিয়োজিত অতিথিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করবে। শিক্ষক সঞ্চালক হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে সাহায্য করবেন। কাজ শেষে শিক্ষক অতিথির উপস্থিতিতেই শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন- যদি তিনি তার কাজে কঠোর কায়িক শ্রম না দিতেন তবে আমাদের সামাজিক জীবন কী রকম ঝুঁকির মুখে পড়ত। এভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিকট কায়িক শ্রমের গুরুত্ব তুলে ধরবেন।

- এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

কাজ

দ্বিতীয় পর্ব

ক্লাস শেষ করার পূর্বে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন। তবে যদি শিক্ষক মনে করেন তাহলে কাজটি শিক্ষার্থীদের এককভাবেও দিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ কায়িক শ্রমে নিয়োজিত অতিথির পেশা নির্দেশ করে ছবি আঁকবে, কেউ কেউ গল্প লিখবে, কেউ কেউ কবিতা বা গানও লিখতে পারে।

এসব লেখা ও ছবি একসাথে করে একটি দেয়াল পত্রিকা বানিয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শন করতে হবে।

- এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

২০২৫

পাঠ ৫ ও ৬ : মেধাশ্রমের গুরুত্ব

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা মেধাশ্রম কী এবং মেধাশ্রমের উদাহরণ সম্পর্কে জেনেছি। এখন আমরা জানব কেন মেধাশ্রম এত গুরুত্বপূর্ণ।

মেধা ব্যয় করে আমরা যে কাজ করে থাকি সে কাজকেই আমরা মেধাশ্রম হিসেবে জানি। মেধা ব্যয় হয় নানা ধরনের কাজে। এরকমই একটি কাজ হলো ইতিহাস লেখা। ইতিহাস হলো মানবসমাজে ঘটে যাওয়া প্রতিদিনের ঘটনার একটি সারসংক্ষেপ। বিশেষ বিশেষ ঘটনা গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়। ইতিহাসের ব্যাপ্তি যথেষ্ট বিস্তৃত। আমাদের, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক সকল কিছুই ইতিহাসের বর্ণনার মধ্যে আসতে পারে। এত কিছু বিবেচনা করে ইতিহাস লেখা সহজ নয়। অনেক মেধা খাটিয়ে তা লিখতে হয়। তাই ইতিহাস আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপুর্ণ। মানবসভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি আগেকার মানুষ কেমন করে বাঁচতো, কী খেতো, কী পরতো, কী খেলতো, কোন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো। যে সময়কার মানুষ ইতিহাস লিখতে পারতো না বা যাদের লেখা ইতিহাস আমরা পাই নি তাদের সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানতে পেরেছি। কাজেই ইতিহাস লেখার কাজে মেধাশ্রমের ব্যবহার আমাদের

অনেক উন্নত জীবনযাপনে সাহায্য করে। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে লেখা গল্প ও কবিতা থেকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, কারা, কীভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, কারা আমাদের সাহায্য করেছেন এসব আমরা জানতে পারি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা নানা স্মৃতিকথা, কবিতা ও গল্প থেকে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যারা গল্প কবিতা-গান ইত্যাদি লিখেছেন তাদের মেধাশ্রমের কারণেই আমরা অতি সহজে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

ছবি আঁকা এক ধরনের মেধাশ্রম। ছবির মাধ্যমেই শিল্পী রংতুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন বিভিন্ন সময়ের, বিভিন্ন মুহূর্তের জনজীবন এবং জনজীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা। এসব ঘটনা আমাদের অনেক কিছু জানতে সাহায্য করে।

ছবি-গল্প-কবিতা থেকে আমরা পুরনো দিনের মানুষের জীবন সম্পর্কে জানতে পারি। গল্প-কবিতা লেখা, ছবি আঁকা সবই মেধাশ্রমের উদাহরণ।

আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে প্রতিদিন বাতি জ্বালাই, পাখা চালাই সেই বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়েছে মেধাশ্রমের ফলেই। যে পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজি, যে সাইকেল, রিকশা, ভ্যান বা মোটরগাড়ি ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করি এই সবকিছুই আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে মেধাশ্রম দিয়েই।

আমরা সবাই বই পড়ি। বই পড়ে অনেক কিছু শিখি। বই পড়ে নানা কিছু শেখা মেধাশ্রমের উদাহরণ। সর্বোপরি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেধাশ্রম প্রয়োজন। মেধাশ্রম ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাই মেধাশ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

কাজ

'মানবসভ্যতা বিকাশে মেধাশ্রমের ভূমিকাই মুখ্য'-এ বিষয়ে বিতর্ক আয়োজন।

- বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

পাঠ ৭ ও ৮ : মেধাশ্রমের অনুশীলন

মনে কর, ছবির ক্লাসটি তোমার নিজের। তোমার শিক্ষক তোমাদের কাছে মেধাশ্রমের কিছু উদাহরণ জানতে চাইলেন। তুমি ছবির শিক্ষার্থীদের হয়ে উত্তর করার জন্য ফাঁকা বক্সে তোমার উত্তর লিখ।

কাজ : ছবি দেখে বলা

নিচের ছবিটি লক্ষ কর। তোমরা কি বলতে পারবে ছবিটি কখনকার? কী ঘটনার পরিচয় বহন করে, কবে ও কোন দেশের-ছবিটি দেখে তোমার অনুভূতি কী ? তোমার নিজের খাতায় এ প্রশ্নের উত্তর লিখ। শিক্ষক সবার লেখার পর ছবিটির পেছনে যে মেধাশ্রম দেওয়া হয়েছে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন ।

ছবিটি থেকে আমরা কী জানতে পারি, ছবিটি না থাকলে আমরা কী জানতে পারতাম না ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন।

(যেমন- ছবিটি না থাকলে আমরা জানতে পারতাম না যে কিশোরেরাও মুক্তিযুদ্ধ করেছে)

**এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

কাজ

ছবিটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা দাও।

পাঠ ৯ : মেধাশ্রমের গল্প

পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা তাদের মেধাশ্রমের কারণে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরা মানুষের মুক্তির জন্য, কল্যাণের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। অর্জিত জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর মেধাশ্রম দিয়ে তাঁরা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন মুক্তির পথ, অগ্রগতির পথ।

কাজ

তোমার এলাকার/পরিচিত কোনো ব্যক্তির মেধাশ্রমের ব্যাপারে একটি অনুচ্ছেদ লিখ এবং তা শিক্ষককে দেখাও। তোমার লেখা অনুচ্ছেদ তোমার সহপাঠীদের পড়তে দাও, তাদের লেখাটিও তুমি পড়।

আনা ফ্র্যাংক ১৯২৯ সালের ১২ই জুন জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে ইহুদিদের উপরে নির্যাতন এতো বেড়েছিল যে তাঁর পরিবার নেদারল্যান্ডসের অ্যামস্টারডাম শহরে পালিয়ে আসে। ১৯৪০ সালে সেই শহরও নাৎসি বাহিনী দখল করে নেয়। তখন আনা ফ্রাংকের পরিবার একটি বাড়ির গোপন কুঠুরিতে আত্মগোপন করে। ত্রয়োদশ জন্মদিনে উপহার পাওয়া একটি ডায়েরিতে কিশোরী আনা ফ্রাংক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ১২ই জুন ১৯৪২ থেকে ১লা আগস্ট ১৯৪৪ পর্যন্ত সময়টিকে তুলে ধরেছেন। বিশ্বযুদ্ধের এমন হৃদয়স্পর্শী ও মর্মান্তিক লিখিত বর্ণনা আনা ফ্রাংকের আগে আর কেউ করেন নি। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা আগস্ট গোপন কুঠুরির সবাই ধরা পড়ে যান। তাঁর বাবা অটো ফ্রাংক ছাড়া সবাই বন্দিশিবিরগুলোয় মৃত্যুবরণ করেন।

আনা ফ্রাংক জার্মানির হ্যানোভার শহরের বার্জেন-বেলসন বন্দিশিবিরে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আনার দিনলিপিগুলো ১৯৪৭ সালে তাঁর বাবা ডাচ ভাষায় প্রকাশ করেন। বইয়ের নাম দেন 'হেট অ্যাকটারবুস' (বাংলায় 'গোপন কুঠুরি')। পরে বইয়ের নাম পাল্টে রাখা হয় আনা ফ্রাংকের ডায়েরি। কেউ কেউ এটির নাম দেন 'দি ডায়েরি অব এ ইয়ং গার্ল'। এ পর্যন্ত প্রায় ৭০টি ভাষায় আনা ফ্রাংকের ডায়েরির কয়েক শত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কিশোরী লেখিকা তাঁর দেখা ও শোনা প্রতিদিনের ঘটনাসমূহের বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন হিটলারের হাতে অবরুদ্ধ থাকা দুঃসহ দিনগুলোর কথা। বিশ্বযুদ্ধের সেই দিনগুলোর বর্ণনা লিখতে গিয়ে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছে, ভাষার যথাযথ ব্যবহার করতে হয়েছে এবং জীবন্ত কথাগুলোকে গুছিয়ে লিখতে হয়েছে। এছাড়া আনা তার দিনলিপি একদল কাল্পনিক বন্ধু-বান্ধবীকে উদ্দেশ করে

লিখেছেন - এখানেই তাঁর চমৎকার কল্পনা শক্তির প্রমাণ পাই আমরা। কাজেই আনা ফ্রাংকের ডায়েরি তাঁর মেধাশ্রমের উদাহরণ।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন দুর্ভিক্ষ নিয়ে অনেকগুলো ছবি এঁকেছেন। বাংলা ১১৭৬ সালে এদেশে অনেক বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। ঐ দুর্ভিক্ষে এই ভূখণ্ডের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ (প্রায় এক কোটি) মানুষ মারা গিয়েছিলেন। এরপরও বাংলায় অনেকবার দুর্ভিক্ষ হয়। বাংলা ১৩৫০ এর মন্বন্তর নিয়ে তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন। সেসব ছবি থেকে আমরা জানতে পারি, বুঝতে পারি কতটা কষ্ট হয়েছিল সেসময় মানুষের, কতটা করুণ ও হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি আমরা। দুর্ভিক্ষের সেসব ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে অনেক মেধাশ্রম দিতে হয়েছে। এসব মেধাশ্রম আমাদের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। অতীতে ঘটে যাওয়া নানা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে আমাদের চোখে জীবন্ত করে তোলে। আমরা সেইসব ঘটনা বা দিনের কথা জানতে আগ্রহী হই। অতীতের সে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি যা আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও বেশি নিরাপদ ও কল্যাণমুখী করে। তাছাড়া আমরা নিত্য যে সব সমস্যার মুখোমুখি হই তা সমাধানে বা দূর করার জন্যও প্রয়োজন হয় মেধাশ্রম।

পাঠ ১০ : আত্মমর্যাদা বজায় রেখে কাজ করা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের তাই রয়েছে প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ। সমাজে আমরা সবাই মিলেমিশে বাস করি। নানা পেশার মানুষ, নানা বয়সের মানুষ, নানা ধর্ম-নানা জাতের মানুষ। মানুষ হিসেবে আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রেখে কাজ করা প্রয়োজন।

যারা দুর্নীতি করে, সবাই তাদের খারাপ বলে। যারা ঘুষ খেয়ে অন্যায় কাজে মানুষকে সাহায্য করে তাদের সবাই ঘৃণা করে, মন্দ বলে। যারা আত্মমর্যাদাবান মানুষ তারা অন্যের কাছে ছোটো হতে চায় না, জনসমাজে লজ্জা পেতে চায় না। তাই তারা কখনো অন্যায় কোনো কিছু করে না, মন্দ কাজ এড়িয়ে চলে। যাদের আত্মমর্যাদাবোধ নেই তারাই এসব হীন কাজ করে।

যাদের আত্মমর্যাদা রয়েছে তারা কখনো পরীক্ষায় অন্যের খাতা দেখে লেখে না। কারণ তারা মনে

করে অন্যের খাতা দেখে লেখা চুরি করার শামিল। একজন আত্মমর্যাদাবান মানুষ কখনো কিছু চুরি করতে পারে না।

অনেকে মনে করে কায়িক পরিশ্রমের কাজ করা মর্যাদা হানিকর। তারা নিজের কাজ নিজে করতে চায় না। একবার ভেবে দেখো তো, রিকশা চালানো পরিশ্রমের কাজ ভেবে সবাই যদি রিকশা চালানো বন্ধ করে দেয় তাহলে আমাদের কী হবে? আসলে কোনো কাজই মর্যাদা হানিকর নয়। সকল কাজই মর্যাদাপূর্ণ। যারা নিজের কাজ নিজে করে না তারা আসলে আত্মমর্যাদাবান নয়। তোমার খাবার যদি অন্য কেউ খায় তাহলে কি তোমার ক্ষুধা মিটবে? তোমার ঘুম যদি অন্য কেউ ঘুমায় তবে কি তোমার ক্লান্তি মিটবে? তোমার খাবার যদি তুমিই খাও, তোমার ঘুম যদি তোমাকেই ঘুমাতে হয় তবে তোমার কাজতো তোমারই করা উচিত, তাই না?

এখন বলো দেখি নিচের ছবিতে আত্মমর্যাদার বিষয়গুলো কীভাবে ফুটে উঠেছে?

পাঠ ১১ ও ১২ : চল আত্মমর্যাদাবান হই

আগের পাঠে আমরা আত্মমর্যাদার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জেনেছি। এই পাঠে আমরা একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রত্যেকের আত্মমর্যাদাবান হওয়া প্রয়োজন। একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

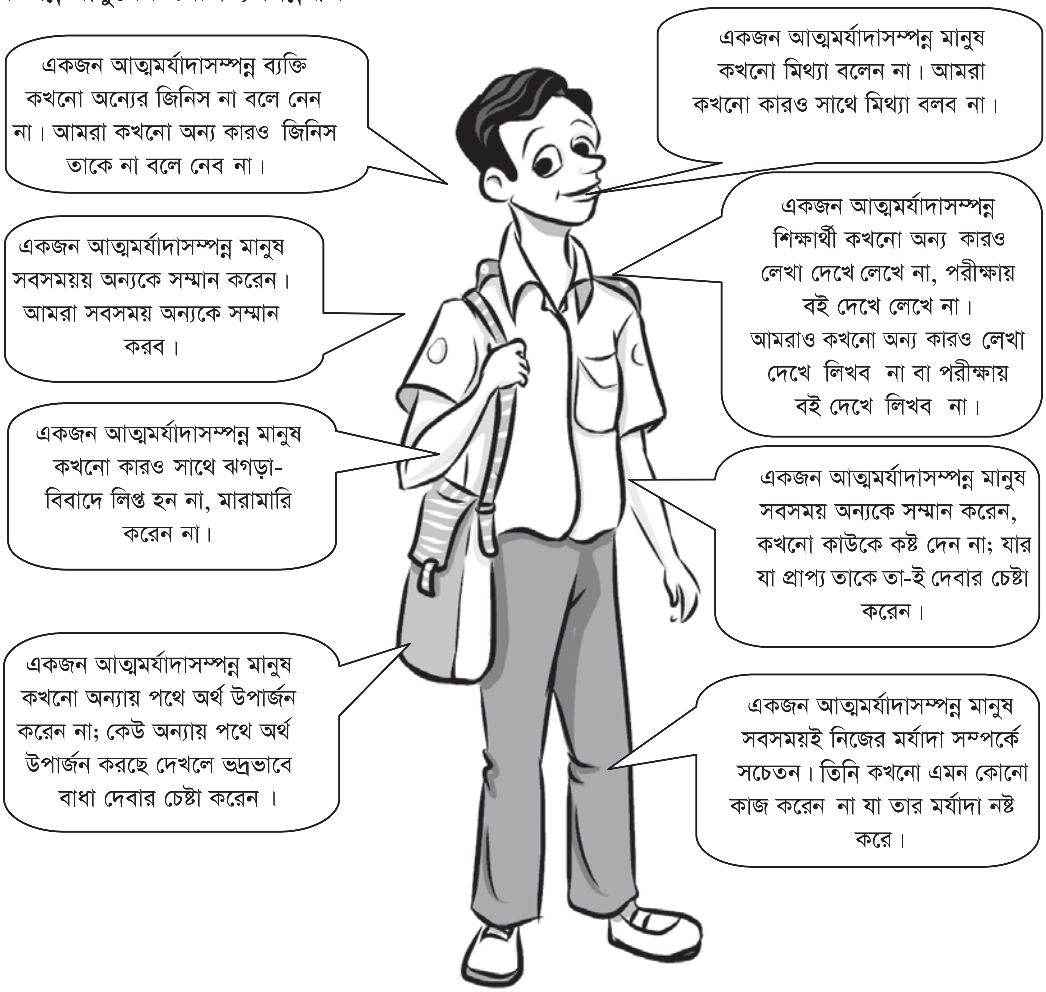

কাজ

প্রত্যেকে নিজের পরিচিত একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ সম্পর্কে ২-৩ মিনিট কথা বলবে।

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া কেন জরুরি?

আমাদের সবার আত্মমর্যাদাবান হওয়া উচিত। আত্মমর্যাদাহীন মানুষ একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারে না। যার আত্মসম্মান নেই সে যে কোনো অন্যায় করতে পারে, দুর্নীতি করতে তার বাধে না, অন্যের জিনিস না বলে নিতেও তার সঙ্কোচবোধ হয় না। যারা এসব করে তাদের আত্মমর্যাদাবোধে ঘাটতি রয়েছে। আমাদের চারপাশে এমন অনেকে আছে যারা নানা ধরনের দুর্নীতির সাথে যুক্ত। যারা জনসাধারণের সম্পদ নষ্ট করে নিজের উদরপূর্তি করে- তাদের আত্মমর্যাদা নেই। একজন আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি অন্যের সম্পদের প্রতি লোভ দেখায় না। একবার ভেবে দেখো তো, সবাই আত্মমর্যাদা নিয়ে চললে দেশ ও সমাজের চিত্র কেমন হতো?

ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বদেশ। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন আমাদের করতে হবে। লাখো শহিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রয়োজন আত্মমর্যাদাবান মানুষ। আত্মমর্যাদাবান মানুষ একদিকে যেমন নির্ভীক দেশপ্রেমিক হয় তেমনি সৎ, সাহসী ও পরিশ্রমী হয়। স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের তাই প্রয়োজন যোগ্য ও আত্মমর্যাদাবান নাগরিক।

দেশের নাগরিক হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। একজন আত্মমর্যাদাবান নাগরিক দেশের নিয়ম-কানুন ঠিকভাবে পালন করেন। দেশের উন্নতি তখনই সম্ভব হবে যখন দেশের সব নাগরিক যথাযথভাবে দেশের নিয়ম-কানুন পালন করবে। আমরা সবাই আমাদের দেশকে অনেক ভালোবাসি। আমরা সবাই চাই আমাদের দেশ হয়ে উঠুক লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার স্বপ্নে দেখা বাংলাদেশ। তাই আমাদের প্রত্যেকের আত্মমর্যাদাবান হওয়া উচিত।

পাঠ ১৩ : কাজে সফলতা ও আত্মবিশ্বাস

কাজের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে আত্মবিশ্বাসের উপর। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা শিখেছি আত্মবিশ্বাস হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস। তবে সে বিশ্বাস কিন্তু অতি বিশ্বাস নয়। কাজে আত্মবিশ্বাস থাকলে আমরা যে কোনো কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারি। আত্মবিশ্বাস কীভাবে মানুষের কাজে সফলতা আনে তার বহু নজির আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই।

তোমরা কি রবার্ট ব্রুসের কাহিনি জানো? তিনি খুব ভালো একজন যোদ্ধা এবং যোগ্য রাজা ছিলেন। শত্রুরা ষড়যন্ত্র করে তাঁর রাজ্য থেকে তাঁকে বিতাড়িত করে। তিনি স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পর পর পাঁচবার যুদ্ধে তিনি তার শত্রুদের কাছে পরাজিত হন। পঞ্চম যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁর আশা ভরসা একেবারে শেষ হয়ে যায়। শত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে তিনি আশ্রয় নিলেন এক গুহার ভেতর। সেখানে এক মাকড়সা তাকে নতুন করে যুদ্ধ করার আত্মবিশ্বাস এনে দিলো। তিনি দেখলেন একটি মাকড়সা বার বার পড়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত প্রবল চেষ্টায় দেয়ালে উঠতে পারল এবং তার জাল বোনা শেষ করল। এ ঘটনা ব্রুসের মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস এনে দিল। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং তাঁর শত্রুদের পরাজিত করলেন। তাঁর এ বিজয় সম্ভব হয়েছিল প্রবল আত্মবিশ্বাসের কারণে।

ইতিহাসে আছে যে, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি মাত্র ১৭জন অগ্রবর্তী সৈন্য নিয়ে নবদ্বীপ (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার একটি শহর) জয় করেছিলেন। নদীয়ার বিশাল সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে কেউই তখন লড়তে সাহস পেতো না। খলজির অভিনব রণকৌশল, অসম সাহস আর প্রবল আত্মবিশ্বাসের জোরেই সম্ভব হয়েছিল সে বিজয়। রণকৌশল আর যত সাহসই থাক, আত্মবিশ্বাস না থাকলে কিন্তু কিছুই সম্ভব হতো না।

সবুজ গ্রামের দরিদ্র কৃষকের সন্তান। তার খুবই পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তারা বেশ গরিব প্রায়ই রহিমের মনে হয়, আর বেশি দিন হয়তো স্কুলে যাওয়া হবে না। এ কথা ভাবতেই বুক ভেঙে কান্না আসে তার। একদিন শিক্ষক বললেন, এবার পরীক্ষায় যে প্রথম হবে তাকে বৃত্তি দেওয়া হবে। সবুজের গৃহশিক্ষক নেই, কোনো বড় ভাই-বোনও নেই। মন কাঁপে দুরুদুরু। তবু সবুজ আত্মবিশ্বাসী

হয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা শুরু করল। কঠোর পরিশ্রমে পড়াশোনা করে ঠিকই সে পরীক্ষায় প্রথম হলো এবং বৃত্তি পেল। সবাই বুঝলো, ভালো ফলাফল করার জন্য গাইড বইয়েরও দরকার নেই, গৃহশিক্ষকেরও দরকার নেই; প্রয়োজন শুধু প্রবল আত্মবিশ্বাস আর কঠোর পরিশ্রম।

এ গল্পগুলো কিন্তু নিছক গল্প নয়, সত্য কাহিনি। এইসব সত্য কাহিনি থেকে আমরা কী বুঝলাম? আমরা বুঝতে পারলাম, কাজে সফলতার জন্য আত্মবিশ্বাস খুবই জরুরি। আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হলে অনেক অসাধ্যও সাধন করা যায়। সফল হতে হলে আত্মবিশ্বাসের কোনো বিকল্প নেই।

পাঠ ১৪ - ১৬ : এসো আত্মবিশ্বাসী হই

আত্মবিশ্বাসী হতে হলে আমাদের জানতে হবে আত্মবিশ্বাসী এবং কম আত্মবিশ্বাসীদের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা কোন দলে পড়ি। আমরা যদি আত্মবিশ্বাসী হই তাহলে নিজেদের আত্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সমাজের জন্য, দেশের জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করতে হবে। আর যদি আমরা কম আত্মবিশ্বাসীদের দলে পড়ি তাহলে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে। তাহলে আমরা দেশ ও দশের কল্যাণে কাজে লাগতে পারব। এসো এখন আমরা আত্মবিশ্বাসী ও কম আত্মবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে কী কী পার্থক্য দেখা যায় তা বোঝার চেষ্টা করি-

আত্মবিশ্বাসী মানুষ	কম আত্মবিশ্বাসী মানুষ
অন্যের কথা শুনেই প্রভাবিত হয় না। আগে তা বুঝে, ভেবে তারপর সিদ্ধান্ত নেয় বা কাজ করে।	অন্যরা যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করে না, ভেবে-চিন্তেও দেখে না।
সবসময় নিত্য নতুন ভালো কাজ অংশ নিতে প্রস্তুত থাকে এবং সুযোগ পেলেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।	নতুন কিছু করতে ভয় পায়, কোনো কাজে অংশ নিতেও ভয় পায়।
নিজে কোনো ভুল করলে তা স্বীকার করে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।	নিজের ভুল স্বীকার করতে ভয় পায়, সবসময় ভুলগুলোকে ঢেকে রাখতে চায়।
পরিবর্তনের কথা শুনেই ভয় পেয়ে যায় না; সম্ভব হলে অংশগ্রহণ করে।	যে কোনো পরিবর্তনের কথা শুনেই ভয় পেয়ে যায়।
যারা আত্মবিশ্বাসী তারা অন্যের কথা বা মতামতকে মূল্যায়ন করে; সবার সাথে বিনয়ী আচরণ করে।	যারা কম আত্মবিশ্বাসী তারা অন্যের কথা শুনতে চায় না। অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় না। তারা আসলে অন্যের কথা বা মতামত শুনতে ভয় পায়।
ঝুঁকি নিতে ভয় পায় না, বরং ঝুঁকি থাকলে খুব সাবধানী হয়ে সামনে এগিয়ে যায়।	যেকোনো ঝুঁকি নিতে ভয় পায়, ঝুঁকির ভয়ে কাজ এড়িয়ে চলে।
ভালোর কোনো শেষ নেই, কাজেই সবসময় আরও ভালো করার চেষ্টা করে।	এদের মধ্যে কাজ ফেলে রাখার মানসিকতা দেখা যায়।

কাজ

আমরা তো সবাই কমবেশি আত্মবিশ্বাসী, তাই না? এসো আজ আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের জীবন থেকে একটি করে গল্প/ঘটনা লিখব যেখানে আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু আত্মমর্যাদাবান, আর যারা আত্মমর্যাদাবান তারা অন্যের লেখা দেখে লেখে না। যারা নিজে নিজে লেখার চেষ্টা করে না তারা কিন্তু আত্মমর্যাদাবান নয়।

লেখা শেষ করে আমরা সবাই মিলে শান্ত হয়ে বসব। শিক্ষক আমাদের একজন একজন করে নিজের লেখা পড়ে শোনাতে বলবেন। আমরা সবাই শিক্ষকের কথা শুনব এবং সে অনুযায়ী কাজ করব ।

লেখা শেষে আমরা সবাই মিলে আমাদের লেখাগুলো দিয়ে খুব সুন্দর দেয়াল পত্রিকা তৈরি করব। অথবা আমরা আমাদের লেখাগুলো আলাদা আলাদা পৃষ্ঠায় লিখে সেলাই করে বইও বানাতে পারি। শক্ত কাগজের মলাট বানিয়ে তার উপর গমের নাড়া বা রং দিয়ে বইয়ের নাম লিখতে পারি। বইয়ের নাম দিতে পারি- "আত্মবিশ্বাসী আমরা" ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: দেয়াল পত্রিকা তৈরি বা বই বানানোর কাজটি আমরা সবাই মিলে শ্রেণিতে বসে করব । বাড়ির কাজ হিসেবে নেব না বা একজন শিক্ষার্থীর উপর দায়িত্ব দিয়ে সবাই নিজেকে অলস প্রমাণ করব না।

* এ কাজে তিনটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

বাদল খুব আত্মবিশ্বাসী। তোমাদের মতো সেও তার জীবনের একটি ঘটনা বলবে যেখানে আমরা তার আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাব। চলো আমরা বাদলের মুখ থেকে শুনি-

আমার নাম বাদল। আমি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। আজ আমি আমার জীবন থেকে আত্মবিশ্বাসের একটি গল্প বলবো। একবার আমাদের গ্রামে খুব ঝড় হলো।ঝড়ে উড়ে গেলো বড়ো বড়ো গাছ। বেশিরভাগ ঘরের চাল উড়ে গেল।এত বড়ো ঝড় কেউ নাকি আগে দেখে নি।আহত হলো অনেক মানুষ।বড়ো রাস্তায় গাছ পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে যান চলাচল। কীভাবে এই আহত মানুষের চিকিৎসা হবে, কীভাবে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাবে- তা নিয়ে সবাই চিন্তা করছে। গ্রামের মোড়ে সমবেত হয়ে সবাই পরামর্শ করছেন কীভাবে কী করা যায়।

সবার মন খারাপ, আহত লোকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা প্রয়োজন কিন্তু কোনো উপায় বের করা যাচ্ছে না। আমার মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি এলো। আমি সবার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম- আমি হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনতে পারি। আমার খুব ভয় করছিল, সবাই ভাবছিল আমি যেতে পারব কি না। আমি বললাম, "আহতদের চিকিৎসা করা দরকার, বড়োরা সবাই মিলে যদি তাড়াতাড়ি ঘর-বাড়ি ঠিক না করে তাহলে আবার বৃষ্টি এলে খুব সমস্যা হয়ে যাবে। তাছাড়া আমি খুব ভালো দৌড়াতে পারি। আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না, শহর তো মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে। আমি ঠিকই ডাক্তার ডেকে আনতে পারব"। আমার একথা শুনে গ্রামের এক মুরুব্বি আমার হাতে ডাক্তার সাহেবকে লেখা একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে রওয়ানা হয়ে যেতে বললেন। তিনি সুস্থ সবাইকে গ্রামের ঘর-বাড়ি ও রাস্তা-ঘাট মেরামতের জন্য কাজে লেগে যেতে বললেন। আমি ২ ঘণ্টা পর ডাক্তার সাহেব আর তার ব্যাগ ভর্তি ওষুধ-পত্র নিয়ে ফিরলাম। গ্রামের সবাই আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। মুরুব্বিরা বললেন, "বাদল আমাদের গর্ব"।

পাঠ ১৭ : কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা শিখেছি যে সৃজনশীলতা বলতে যেমন নতুন কিছু সৃষ্টি করা বোঝায় তেমনি কোনো কাজ নতুন উপায়ে করাকেও বোঝায়। আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে সৃজনশীল। অনেকে আছে অন্যকে অন্ধের মতো অনুকরণ করে। এটা কিন্তু সৃজনশীলতা নয়। সৃজনশীলতা হলো নিজের মতো করে কিছু করা, সবার চেয়ে আলাদা কিছু করা।

বিজ্ঞানীরা সৃজনশীল। তাঁরা এমন অনেক জিনিস তৈরি করেন যা আগে কখনো ছিল না। এমন অনেক জিনিস তাঁরা তৈরি করেন যেগুলোর কথা মানুষ আগে ভাবে নি। তাঁরা এসব জিনিসের কথা ভাবতে পারেন, তৈরি করতে পারেন বলেই তাঁরা সৃজনশীল।

আচ্ছা, আমরা কি ভাবতে পারি যে, হাতি আকাশে উড়বে? ভাবতেই কেমন হাস্যকর লাগে, তাই না?

প্রাচীনকালের মানুষেরা হয়ত ভাবত আহা, হাতি যদি আকাশে উড়ত তাহলে আমরা হয়ত হাতির পিঠে চড়ে উড়ে বেড়াতে পারতাম। বিজ্ঞানীরা মানুষের এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আজ আমরা বিমানে চড়ে আকাশ ভ্রমণ করতে পারি। এমনকি রকেটে চড়ে মহাকাশেও পাড়ি দিতে পারি। এসবই সম্ভব হয়েছে কাজে সৃজনশীলতার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে।

বিজ্ঞানীরা কেন সৃজনশীল? কারণ তাঁরা মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করেন। আমাদের চারপাশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে আরও ভালো কিছু তৈরির চেষ্টা করেন। আমাদের জীবনকে আরও সহজ, নিরাপদ ও আরামদায়ক করার জন্য বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন সামগ্রী তৈরি করেন। এই নিত্য নতুন জিনিস তৈরির জন্য সৃজনশীলতা প্রয়োজন। যেমন ধরো-বাইসাইকেল, যা আমরা সাইকেল নামে চিনি, খুবই প্রয়োজনীয় একটি বাহন। সাইকেলে ভারসাম্য রাখা বেশ কঠিন। আবার বেশি মালামাল বা মানুষ বহনও করা যায় না। তাই বিজ্ঞানীরা সাইকেলে আর একটি বেশি চাকা যোগ করে দিলেন; হয়ে গেল ট্রাইসাইকেল। আজকালকার ভ্যান, রিকশা ইত্যাদি ট্রাইসাইকেলের সুপরিচিত উদাহরণ। আর এই চাকা যোগ করা কিন্তু সৃজনশীলতার একটি

বড়ো উদাহরণ। আবার সময়ের সাথে সাথে আবিষ্কৃত হয়েছে মোটর ইঞ্জিন। সাইকেলের সাথে মোটর ইঞ্জিন জুড়ে দিয়ে আমরা পেয়েছি মোটরসাইকেল। কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের সৃজনশীলতা আমাদের সভ্যতাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে মানুষ কোনো না কোনো যন্ত্র আবিষ্কার করেছে; তারপর ধীরে ধীরে ঐ যন্ত্রটা উন্নত করেছে। আবার একই যন্ত্র দিয়ে যাতে অনেক কাজ করা যায় সেজন্য মানুষ বের করেছে নানা বুদ্ধি। যেমন ধরো মোবাইল টেলিফোন। মোবাইলফোন নামের এই ছোট্ট যন্ত্রটি দিয়ে আমরা যেমন কথা বলতে পারি তেমনি গান শুনতে পারি, করতে পারি হিসাব-নিকাশ, টুকে রাখতে পারি কোনো তথ্য, মেসেজ পাঠাতে পারি, ভিডিও দেখতে পারি, গেমস খেলতে পারি এমন কি ইন্টারনেটও ব্যবহার করতে পারি। একদিনেই মোবাইলফোন এতো উন্নত হয়ে যায় নি। দিনের পর দিন শত শত মানুষ যারা মোবাইলফোন তৈরির কাজে যুক্ত, তাদের কাজে সৃজনশীলতা প্রয়োগের মাধ্যমেই আজ আমরা এক মোবাইলফোনের ভেতর এতো কিছু পেয়েছি। তাছাড়া মোবাইলফোনের চেহারাতেও আছে বৈচিত্র্য। নানা রং, নানা ডিজাইন। যারা মোবাইলফোনের ডিজাইন করেন তাদের কাজের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হচ্ছে নিত্য নতুন ডিজাইনের উদ্ভব।

পাঠ ১৮ - ২০ : সৃজনশীলতা কেন প্রয়োজন

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু কেন এবং কীভাবে মানুষ সৃষ্টির সেরা? পৃথিবীর সব প্রাণী খাবার সংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করে, বেঁচে থাকার জন্য কষ্ট করে। একবার ভেবে দেখো, মানুষের চেয়ে বাঘ, সিংহ কিংবা হাতি কতো বেশি শক্তিশালী। তবুও হাতি মানুষকে নয় মানুষই হাতিকে নানা কাজে ব্যবহার করে। পাখি কতো সহজে নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়। নীল আকাশই পাখির সীমানা। মানুষ নীল আসমান পার হয়ে পৌঁছে গেছে চাঁদে। মানুষ প্রকৃতির দানকে ব্যবহার করছে তার নিজের মতো করে। এ সবই সম্ভব হয়েছে তার সৃজনশীলতার কারণে।

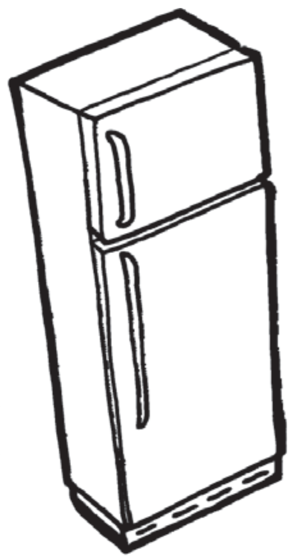

গরমের দিনে প্রচণ্ড তাপে আমাদের ঠাণ্ডা পানির তৃষ্ণা লাগে। তাই সৃজনশীল মানুষ তৈরি করেছে রেফ্রিজারেটর যা আমরা সংক্ষেপে ফ্রিজ নামে চিনি। আকাশের বিদ্যুৎকে বেঁধে নিজের কাজে লাগানো আজ আর কল্পনা নয়, একেবারে সত্যি। এটা সম্ভব হয়েছে মানুষের সৃজনশীল ভাবনা আর নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবনের ফলে।

২০২৫

তোমাদের চারপাশে যারা বসবাস করে তাদের সবার কাপড়-চোপড় কি একই রকম? দেখো কতো বাহারি রং, তাতে কতো রকম নকশা; একেকটা পোশাক আবার একেক রকম। গলার কাছে, লম্বায়, হাতার নকশায় পার্থক্য আছে তাই না? আচ্ছা কখনো কি ভেবে দেখেছো যারা এসব পোশাক বানায়, নতুন রকমের পোশাক, নতুন নকশা আর রং দিয়ে তারা এসব কীভাবে পারে? সৃজনশীল চিন্তা করে বলেই তাঁরা পারেন। তোমাদের চারপাশের বাড়িঘরগুলো দেখো। এক একটি বাড়ি-ঘরের নকশা বানাবার উপকরণ একেক রকম। এর মধ্যেও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে। আবার দেখ, তোমাদের মধ্যে কেউ সবসময় বেশ পরিপাটি হয়ে থাকে, কেউ বা আর সবার চেয়ে

আলাদাভাবে চুল বাঁধে, কেউ বা খুব সুন্দর করে কথা বলে, কেউ বা কাগজ দিয়ে অনেক কিছু বানাতে পারে, কেউবা অন্য কারও গলা অনুকরণ করে কথা বলতে পারে, এসবই কিন্তু সৃজনশীলতার উদাহরণ। নতুনভাবে কিছু করার মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃজনশীলতা। এখন ভেবে দেখো, যদি সৃজনশীলতা না থাকত তবে হয়তো সবাই একই রঙের, একই নকশার, একই রকম পোশাক পরত, সব বাড়ি-ঘর দেখতে একই রকম হতো। সেটা হয়ত ভালো হতো না। তাছাড়া সৃজনশীলতা না থাকলে আমরা হয়ত আজও পাহাড়ের গুহায় বসবাস করতাম, কুড়ানো ফলমূল আর গাছের শেকড়-পাতা খেয়ে থাকতে হতো। এমনকি সৃজনশীলতা না থাকলে পোশাকও আবিষ্কার করা সম্ভব হতো না। কাজেই ভেবে দেখ, সৃজনশীলতা আমাদের কতো প্রয়োজন?

কাজ

এসো প্রত্যেকে ছোট্ট করে একটা অনুচ্ছেদ লিখি।

লেখার বিষয় : সৃজনশীল হয়ে আমি কী করতে চাই?

লেখা শেষ হলে সবাই নিজের লেখা সবার উদ্দেশে পড়ে শোনাই। সবার লেখা একত্র করে আমরা একটা বইও বানাতে পারি।

কীভাবে বই বানাবে : ক্লাসে যাদের হাতের লেখা সুন্দর তারা প্রত্যেকের লেখা আলাদা কাগজে লিখবে, যারা সুন্দর আঁকতে পারে তারা লেখার কাহিনি অনুযায়ী তাতে সুন্দর করে অলংকরণ করবে। এরপর সবগুলো কাগজ এক সাথে করে শক্ত কাগজের মলাট দিয়ে বাঁধাই করে নিবে। মলাটের উপর বইয়ের নাম দিয়ে সুন্দর প্রচ্ছদও এঁকে দিতে পারো।

- এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

সৃজনশীলতার অনুশীলন : আমরা কিছু কাজ করবো যেগুলো আসলে সৃজনশীলতার অনুশীলন। প্রথমেই এসো আমরা নিচের বামপাশের ছবির সাথে ডানপাশের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছবি দাগ টেনে মেলাই-

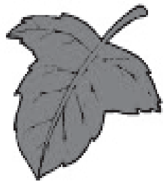
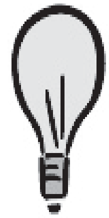
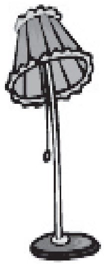

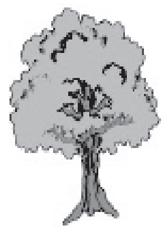

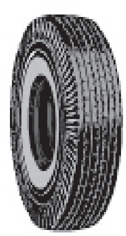

কাজ

উপরের ছবিগুলো থেকে যে কোনো একটি ছবি বেছে নাও। ছবির বস্তুটিসম্পর্কে নিজ নিজ খাতায় **১০-১২** টি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ লিখ। অনুচ্ছেদের নিচে তুমি ঐ বস্তুর ছবি আঁকো এবং তাতে রং কর।

- এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

২০২৫

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি মেধাশ্রমের উদাহরণ?

ক. চিনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ

খ. আগ্রার তাজমহল তৈরি

গ. সাইকেল-রিকশা চালানো

ঘ. মোটরগাড়ি আবিষ্কার

২. যাঁরা আত্মবিশ্বাসী তাঁরা-

i. ঝুঁকি থাকলেও কোনো কাজে পিছিয়ে যায় না

ii. অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা দেখায় না

iii. পরিবর্তনের কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

পোলিও রোগে আক্রান্ত শিশু খলিলুর রহমানকে কবিরাজ দেখায় তার মা বাবা। কবিরাজের ভুল চিকিৎসায় শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে যায় দুই বছরের শিশু খলিল। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের অনেকেই তাকে বোঝা হিসেবে মনে করত এবং তাকে ভিক্ষাবৃত্তিতে লাগিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিত। কিন্তু তার মা বাবা তাদের পরামর্শ না শুনে তাকে স্কুলে পড়ালেখা শুরু করালেন। খলিল পড়ালেখায় আনন্দ খুঁজে পায় এবং চেষ্টা অব্যাহত রাখে। সকল বাধা অতিক্রম করে খলিল আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী।

ক. মেধাশ্রম কী?

খ. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া জরুরি কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. সামনে এগিয়ে যেতে খলিলুর রহমানের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা বর্ণনা কর।

ঘ. প্রতিবেশীদের পরামর্শ না শোনার বিষয়ে খলিলুর রহমানের মা–বাবার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিবারিক কাজ ও পেশা

প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের কিছু কাজ করতে হয় এবং কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত হতে হয়। পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদের বিভিন্ন পারিবারিক কাজে অন্যদের সহায়তা করতে হয়। কিছু কাজ আছে যা পরিবারের বাইরের ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই অধ্যায়ে এসব কাজের গুরুত্ব এবং বিভিন্ন কাজ ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা –

- প্রাত্যহিক জীবনে নিজের কাজ নিজে করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবারের সদস্যদের পেশায় নিয়োজিত থাকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবারের বাইরের ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত প্রাত্যহিক জীবনের কাজগুলো মূল্যায়ন করতে পারব।
- বিভিন্ন কাজ ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবারের অন্য সদস্যদের কাজে সহায়তা করতে পারব।
- বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কায়িক কাজসমূহ করতে পারব।
- নিজ বিদ্যালয়ের বাইরে অন্য বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কায়িক কাজসমূহ করতে পারব।
- বাস্তব পরিস্থিতিতে কায়িক কাজ করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত কাজ বিষয়ক একটি নাটিকায় অংশগ্রহণ করতে পারব।
- কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করব।
- বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

পাঠ ২১ - ২৪ : প্রাত্যহিক জীবনের কাজগুলো নিজে করার গুরুত্ব

নিজের কাজ নিজে করার গুরুত্ব অনেক। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাজগুলো বেশিরভাগই নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কাজগুলো যদি প্রত্যেকে নিজে নিজেই করি তাহলে কাজের সৌন্দর্য যেমন বাড়ে তেমনি কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করালে সে কাজের গুরুত্ব কমে যায়; কাজটি দায়সারা গোছের হয়। তাছাড়া অন্যকে দিয়ে করালে তারা কাজটি আন্তরিকভাবে করে না বা করতে চায় না। এছাড়াও এমন অনেক কাজ আছে যেগুলো অন্যের মাধ্যমে করানো একেবারেই উচিত নয়। এজন্য নিজের কাজ নিজে করাই উত্তম। যেমন- নিজের জামা-কাপড় নিজেই ধোয়া ভালো। অন্যদের দিয়ে ধোয়ালে তা ভালোভাবে পরিষ্কার নাও হতে পারে এবং জামা-কাপড় নষ্ট হতে পারে।

কাজ
তোমরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাও। একটি দল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে কী কী কাজ থাকতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর। আর অন্য দলটি নিজের কাজ নিজে করার গুরুত্ব আলোচনা করে লিপিবদ্ধ কর। উভয় দলের কাজ শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নিজের কাজ নিজে করার গুরুত্ব

সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করা যায়: নিজের কাজটি যদি নিজে করো তাহলে কাজটি তুমি যেভাবে করতে চাইবে সেভাবেই করতে পারবে। কাজটি তুমি যেভাবে করতে চাইবে সেটি তোমার চেয়ে আর কেউ ভালো বুঝতে পারবে না। অন্য কাউকে দিয়ে যদি তোমার কাজ করাতে চাও সেক্ষেত্রে তার নিজের পদ্ধতি বা ধরনের উপর তোমাকে নির্ভর করতে হবে যা তোমার পছন্দ নাও হতে পারে। যেমন: স্কুল ব্যাগ গুছানো। ব্যাগের কোন পকেটে কী রাখবে বা কী রাখলে ভালো হয় তা তুমিই ভালো বুঝবে; অন্যকে ব্যাগ গোছাতে দিলে সে এলোমেলো করে রাখবে এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পাবে না।

দক্ষতা বৃদ্ধি পায়: যে যত বেশি কাজ করে তার কাজের হাত তত পাকা হয়। নিজের কাজ নিজে করলে কাজ করতে করতে একসময় তোমার কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তুমি এই সুযোগ পাবে না এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। যেমন: বিছানা গোছানো। তুমি যদি এখন থেকেই বিছানা না গোছাও তাহলে পরবর্তীতে পরিবারের বাইরে অর্থাৎ হোস্টেলে বা অন্য কোথাও গেলে বিছানা গোছানো নিয়ে সমস্যায় পড়বে।

নিজের মনের মতো কাজ করা যায়: প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব ধ্যান-ধারণা আছে এবং সব মানুষই কাজ করার ক্ষেত্রে নিজের মনের মতো করে কাজটি করতে চায়। নিজের কাজ

নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করালে নিজের চিন্তা-চেতনার প্রয়োগ ঘটানোর সুযোগ থাকে না এবং কাজটি নিজের মনের মতো হয় না। যেমন: পড়ার টেবিল গোছানো। টেবিলের উপরে কী কী জিনিস রাখবে, টেবিলের পাশের দেয়ালে কী লাগানো থাকবে তা তুমি নিজেই ঠিক করবে। তাহলে তোমার পড়ার টেবিল তুমি নিজের মনমতো করে গোছাতে পারবে।

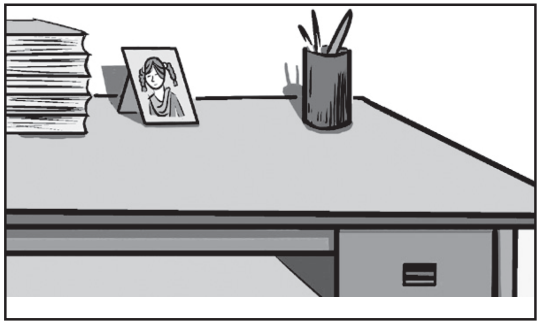

একান্তে কাজ করা যায়: এমন কিছু কাজ আছে যা একান্তে করা প্রয়োজন। এ কাজগুলো অন্যদের দিয়ে করালে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নষ্ট হয়। এসব ক্ষেত্রে নিজের কাজ নিজে করাই উত্তম।

অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় : যে যত বেশি অভিজ্ঞ সে তত নিপুণভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে এবং যে যত বেশি কাজ করে সে তত বেশি অভিজ্ঞ। কাজ করতে করতেই মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তুমি যদি তোমার কাজগুলো নিজেই করো তাহলে তোমার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে এবং যেকোনো কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে পারবে।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়: যেকোনো কাজে সফল হওয়ার জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা গুরুত্বপূর্ণ। বেশি বেশি কাজ করলে কাজের ভুল থেকে শেখার সুযোগ হয় এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়।

অর্থের সাশ্রয় হয়: নিজের কাজ অন্যকে দিয়ে করাতে গেলে তাকে তার শ্রমের দাম দিতে হয়; এজন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন: ধোপাকে দিয়ে কাপড় ধোয়ালে অর্থ ব্যয় হয়। নিজের কাজ নিজে করলে সে অর্থ নিজেরই থেকে যাবে।

সৃজনশীলতার বিকাশ হয়: কাজ করতে করতে মানুষ দক্ষতা অর্জন করে। যেমন: কাজ করার নিত্য নতুন পদ্ধতি ও উপায় উদ্ভাবন, ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে নতুন কিছু তৈরি করা এবং সময় বাঁচিয়ে কাজ করা ইত্যাদি। তুমি যদি নিজের কাজ নিজেই কর তাহলে তুমিও এরকম নতুন কিছু করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে তোমার সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে।

সুস্থ দেহে সুস্থ মন: কাজ করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে। কাজ করার মাধ্যমে শরীরের পেশিগুলোর সঞ্চালন হয় ও শরীরের ব্যায়াম হয়। এতে মনও অনেক প্রফুল্ল থাকে। নিজের কাজ নিজে করলে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকে।

সময়মতো কাজ সম্পাদন করা যায়: নিজের কাজ নিজে করলে সময়মতো কাজ শেষ করা যায়। অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। তাছাড়া সে তোমার সময় এবং প্রয়োজনের গুরুত্ব নাও বুঝতে পারে। সে যদি সময়মতো কাজ না করতে পারে এতে তুমি সমস্যায় পড়তে পারো। সুতরাং নিজের কাজ নিজে করাই ভালো।

কাজ
"শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে চারটি দলে ভাগ করবেন। প্রতিটি দল পরিবারে নিজের কাজ নিজে করার উপর একটি নাটিকা প্রস্তুত করবে। শ্রেণিতে ভূমিকাভিনয় করে দেখাবে।
*এ কাজে দুটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

পাঠ ২৫ : আমাদের জীবনে পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব

এসো নিচের গল্পটি পড়ি

জসিমরা তিন ভাইবোন। জসিমের বয়স ১৬ বছর, তার ভাই সোহেলের বয়স ১২ বছর আর ছোটো বোন মিলির বয়স ৮ বছর। তাদের নিজেদের কোনো আবাদি জমি নেই। তাদের বাবা অন্যের জমিতে সারাদিন হাঁড়ভাঙা পরিশ্রম করেন। অবসর সময়ে তিনি বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন জিনিস তৈরি করেন। এগুলো হাটে বিক্রি করে তিনি সামান্য আয় করেন। তাদের মা সংসারের কাজের পাশাপাশি বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন ও আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ করেন। হাঁস-মুরগির ডিম ও শাক-সবজি বিক্রি করে তারা আয় করেন।

তাদের এই পরিশ্রমের ফলে জসিম কলেজে এবং সোহেল ও ছোটো বোন মিলি স্কুলে পড়ছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি বাবা-মা তাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। তাদেরকে পুষ্টিকর খাবার দেন, অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সন্তানদের বিনোদনের জন্য তারা বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যান।

তোমরা এ গল্পটি পড়ে কী বুঝলে? পরিবারের কেউ যদি কোনো কাজে জড়িত না থাকে তাহলে যে যে সমস্যা হয় তা নিচের ছকটিতে লিখ-

ক্রম	সমস্যা
১	
২	
৩	
৪	
৫	

তোমরা সকলেই জানো মানুষ হিসেবে ভালোভাবে বাঁচতে, শিক্ষা লাভ করতে, সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে আমাদের সকলের স্বপ্ন বা ইচ্ছা থাকে। আমাদের এ স্বপ্ন বা ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন অর্থের। পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন কাজে জড়িত হওয়া আমাদের এস্বপ্নগুলো

বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে। যদি পরিবারের কেউ কোনো কাজে জড়িত না হন তাহলে কী করে তাঁরা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন? আমাদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, বিনোদন, চিকিৎসা ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই তাঁরা সহযোগিতা করেন। এজন্য আমাদের জীবনে পরিবারের অন্যদের কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি। এ বিষয়ে আমরা নিচে আলোচনা করছি:

ভরণ-পোষণ: পরিবারের সদস্যদের কাজে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়। তারা যদি কেউ কোনো কাজ না করেন তাহলে আমাদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক এগুলো আসতো কোথা থেকে? এজন্য আমাদের পরিবারের কর্মপযোগীদের কাজে জড়িত হওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা: সবাই চায় তাদের সন্তানরা লেখাপড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করুক। লেখাপড়ায় অর্থের প্রয়োজন হয়। পরিবারের সদস্যদের কাজের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার ব্যয় মেটানো সম্ভব হয়। সুতরাং আমাদের জীবনে পরিবারের সদস্যদের কোনো না কোনো পেশায় নিয়োজিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসা: অনেক সময় পরিবারের কোনো সদস্য দুর্ঘটনা বা বিভিন্ন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসময় চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে নিতে হয়, ডাক্তার দেখাতে হয়, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হয় ও ওষুধ কিনতে হয়। এসব করার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থের। পরিবারের কেউ যদি কোনো কাজে নিয়োজিত না থাকেন তাহলে এ অর্থের সংকুলান হবে কীভাবে?

বিনোদন: মানুষের সুস্থ-সবলভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিনোদন হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিনোদনকে বলা হয় মনের খোরাক। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে যাওয়া, কোথাও ঘুরতে যাওয়া, বিভিন্ন উৎসবে যোগ দেওয়া, বিশেষ দিনে মজা করা, নাটক দেখা ও গান শোনা-এসব বিনোদনের অংশ। এসব করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার জোগান দেন পরিবারের সদস্যরা।

পরনির্ভরশীলতা: পরিবারের সদস্যরা যদি কোনো কাজে নিয়োজিত না হন তাহলে জীবনধারণের জন্য আমাদেরকে অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। অন্যের দয়ার মাধ্যমে জীবনধারণ করা সকলের কাছেই অসম্মানের। এজন্য অসম্মান থেকে বাঁচতে পরিবারের সদস্যদেরকে কোনো না কোনো কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে হবে।

সামাজিক মর্যাদা: যে পরিবারের সদস্যরা কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত থাকেন সমাজে ঐ পরিবারের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে যে পরিবারের সদস্যরা কোনো কাজ করে না সমাজে তাদের কোনো গুরুত্ব ও মর্যাদা নেই। কেউ তাদেরকে পছন্দ করে না, সম্মান করে না এবং এ কারণে সমাজে তাদেরকে হেয় হতে হয়। তাই সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বসবাস করার জন্য কাজে জড়িত হওয়া জরুরি।

কাজ

তোমরা প্রত্যেকে নীরবে পাঠটি পড়। এবার পরিবারের অন্যরা কোনো কাজে জড়িত না হলে তোমাদের জীবনে আরও কী কী সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে দুজন দুজন করে আলোচনা কর। নতুন কোনো সমস্যা চিহ্নিত হলে সেগুলো উপস্থাপন কর।

পাঠ ২৬ ও ২৭ : পরিবারের অন্যদের কাজে সহায়তা

তোমরা জেনেছ যে তোমাদের জীবনের অনেক কাজে পরিবারের সদস্যরা অনেক ভূমিকা রাখেন ও সহায়তা করেন। পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তোমারও অন্যদের কাজে সহায়তা করার দায়িত্ব রয়েছে। পরিবারের অন্যদের যে সকল কাজে তোমার সহায়তা করা সম্ভব তুমি সেসব কাজে তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী সহায়তা করতে পারো। অনেক সময় দেখা যায় পরিবারে কাজ করার লোক খুব কম। তখন একজন বা দুজনের পক্ষে সবগুলো কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিবারে অন্যদের কাজে সহায়তা করা তোমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। তাছাড়া পরিবারের কাজ তো পরিবারের সকল সদস্যেরই কাজ। পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তোমারও পরিবারের কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত। পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তুমি যদি অন্যদের কাজে সহায়তা করো তাহলে পরিবারে অন্যদের ওপর কাজের চাপ কমবে। যদি পরিবারের প্রত্যেক সদস্য তাদের নিজ নিজ কাজ যথাসময়ে সম্পাদন করে তাহলে কোনো একজনের উপর কাজের চাপ পড়বে না। তোমরা দেখে থাকবে যেসব পরিবারের সকল সদস্য তাদের নিজ নিজ কাজ করার পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহায়তা করেন সেসব পরিবার অনেক সুশৃঙ্খল ও সুখী হয়ে থাকে।

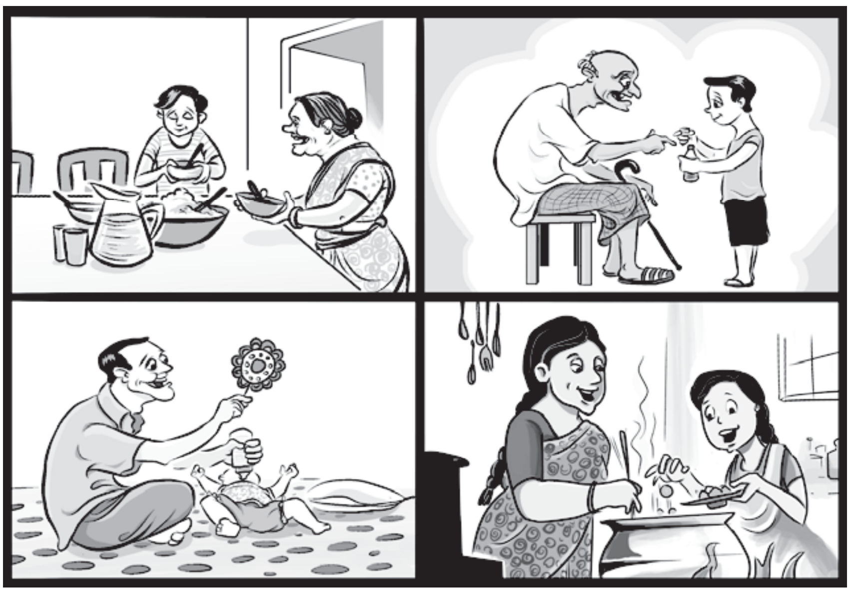

কাজ

শিক্ষক পারিবারিক কাজে সাহায্য করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে আহ্বান করবেন। (ক্ষেত্রগুলো হতে পারে: ছোটো ভাইবোনদের যত্ন ও লেখাপড়া, গৃহসজ্জায় সহায়তা, খাবার তৈরিতে সহায়তা ইত্যাদি।)
*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

এবার নিচের গল্পটি পড়ি-

আব্দুল করিম সাহেব একজন সরকারি চাকরিজীবী। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে হাসান গ্রামের স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে আর মেয়ে নাসিমা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। ওদের মা আমেনা বেগম একজন গৃহিণী। তারা গ্রামে বাস করেন।

আজ বৃহস্পতিবার। আব্দুল করিম সাহেবের দুই সন্তানের মনে খুব আনন্দ। কারণ শুক্রবার নানা-নানি তাদের বাড়িতে বেড়াতে আসবেন। বিকেলে খেলাধুলা শেষে হাসান তার বাবাকে গরু গোয়ালে বাঁধা ও খড় দেওয়ার কাজে সাহায্য করেছে আর নাসিমা তার মাকে হাঁস-মুরগি খোয়াড়ে রাখতে সহায়তা করেছে। সন্ধ্যায় আব্দুল করিম সাহেব তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে একসাথে নাস্তা করতে বসলেন। এসময় তারা আগামীকাল কী কী করবেন তার একটি পরিকল্পনা করলেন।

শুক্রবার সকাল। হাসান ও নাসিমা ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিল। এরপর দুই ভাইবোন মিলে বিছানা ও ঘর গোছানোর কাজে তাদের মাকে সহযোগিতা করল। নাস্তা করার পর হাসান তার বাবার সাথে বাজারে গেল। তারা মাছ, মাংস, সবজি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে বাড়িতে ফিরে এলো। আর নাসিমা তার মায়ের সাথে রান্নার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। সে তার মাকে বিভিন্ন জিনিস এগিয়ে দিচ্ছে। তরকারি কাটা, মাছ ও মাংস কাটা, পানি এনে দেওয়া ইত্যাদি কাজে সে তার মাকে সহায়তা করছে।

সকাল ১১ টার দিকে তাদের নানা-নানি এলেন। তাঁরা তাদের নাতি-নাতনির জন্য মিষ্টি ও ফল এনেছেন। হাসান ও নাসিমা তো মহাখুশি। তারা তাদের নানা-নানির সাথে গল্প করতে লাগল। অতিথিদের খাবার তৈরি হওয়ার পর হাসান ও নাসিমা খাবার পরিবেশনে তাদের মাকে সহায়তা করল। তারপর সবাই একসাথে খাওয়া শেষ করে গল্প করতে বসলেন।

কাজঃ হাসান ও নাসিমা তাদের মা-বাবাকে যে যে কাজে সহযোগিতা করেছে নিচের টেবিলে সেগুলো লিখ :

ক্রম	কাজ
১	
২	
৩	
৪	

কাজ

প্রত্যেকে গত এক সপ্তাহে পরিবারের অন্যদের কী কী কাজে সহায়তা করেছো তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

পাঠ ২৮ ও ২৯ : পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ ও পেশা

তোমরা কি জানো পরিবারে কী কী ধরনের ব্যয় থাকতে পারে? কীভাবে একটি পরিবার চলে? কারা সেই ব্যয় বহন করেন? কী কাজ করে তারা সেই ব্যয় বহনের জন্য অর্থ উপার্জন করেন? আজকের আলোচনায় আমরা সে বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব। আমরা সকলেই জানি একটি পরিবারে প্রতিদিনে, সপ্তাহে, মাসে কিংবা বছরে অনেক ধরনের ব্যয় হয় বা ব্যয়ের পরিকল্পনা থাকে। এ ব্যয়গুলোকে আমরা ভরণ-পোষণ ব্যয় বলি। অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটি পরিবারে এ খরচগুলো হয়।

ভরণ-পোষণের মধ্যে কী কী ব্যয় থাকতে পারে তা তোমরা নিচের টেবিলটিতে লিখ :

ক্রম	ব্যয়
১	খাদ্য
২	....
৩	পোশাক
৪	....
৫	বিদ্যালয়ের বেতন ও ফিস
৬	....
৭	....
৮	চিকিৎসা/ওষুধ
৯	....
১০	....

তোমরা কি জানো পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কার? পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পরিবারেরই কোনো না কোনো সদস্যকে নিতে হয়। আমাদের দেশে, সাধারণত আমরা দেখি মা-বাবা, বড়ো ভাই বা বোন পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অর্থাৎ পরিবারের যিনি বা যারা বড়ো তিনিই বা তারাই পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। পরিবারের কেউ এই দায়িত্ব না নিলে পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ হবে কোথা থেকে? সেজন্য এই দায়িত্ব বর্তায় পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যদের উপরই।

তোমরা কি জানো পেশা কী? পেশা হচ্ছে কাজ বা কাজের ক্ষেত্র। অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সামাজিকভাবে স্বীকৃত কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ বা বিশেষ কাজ করাকে পেশা বলে। যেমন: একজন কৃষক তার দক্ষতা অনুযায়ী জমিতে চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেন, এজন্য তার পেশা হচ্ছে কৃষি। আবার একজন ডাক্তার তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করে উপার্জন করেন এজন্য তার পেশা হচ্ছে চিকিৎসা। এভাবে প্রত্যেক মানুষ নিজের দক্ষতা অনুযায়ী যে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন সে কাজই হচ্ছে তার পেশা।

পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদেরকে আয় করতে হয় এবং এর জন্য কোনো না কোনো আয়সৃজনী কাজে জড়িত হতে হয়। প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজই হচ্ছে তার পেশা। তোমরা একটু খেয়াল করলেই দেখবে তোমাদের মা-বাবা, চাচা-চাচি, ভাই-বোন বা পরিচিত অনেকেই কোনো না কোনো কাজ করছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের কাজের ক্ষেত্রগুলোতে শ্রম দেন এবং তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক অর্থাৎ টাকা পান। এই যে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন বা শ্রম দিচ্ছেন সে কাজগুলোই তাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি পেশা। পরিবারের ভরণপোষণের কথা চিন্তা করেই তারা এসব পেশায় জড়িত হন।

এসো আমরা নিচের গল্পটি পড়ি–

সাবিনা আদর্শপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সে পড়াশোনায় খুব ভালো। বিদ্যালয়ের সবাই তাকে খুব আদর করেন। সে নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে। সাবিনার বাবার নাম আব্দুল মুক্তাদির। মুক্তাদির সাহেব আদর্শপাড়া গ্রামে বসবাস করেন। স্ত্রী, দুই মেয়ে ও বাবা-মা নিয়ে তার পরিবার। তিনি সেলাইয়ের কাজ ভালো জানেন; এজন্য গ্রামের বাজারে একটি দোকান নিয়ে তিনি দর্জির কাজ করেন। তিনি কষ্ট করে হলেও তার দুই সন্তানকে লেখাপড়া করাতে বদ্ধপরিকর। সাবিনার মা বাড়িতে পরিবারের গৃহস্থালির কাজগুলো করেন। তিনি বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারেন। তিনি এগুলো তার মায়ের কাছ থেকে শিখেছেন। অবসর সময়ে তিনি বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করেন। গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির লোকজন এসে এগুলো কিনে নিয়ে যায়। আবার বেশি হলে তার বাবা হাটে নিয়ে এগুলো বিক্রি করেন। সাবিনার বড়ো বোন গত বছর উপজেলার সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি পাশের গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি তার বাবাকে সংসার চালাতে সহায়তা করেন।

কাজ

নিচের টেবিলে তোমার জানা পেশাগুলো লিখ এবং তার পাশে ঐ পেশায় জড়িত পরিচিতজনের নাম লিখ।

ক্রম	পেশা	পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তির নাম
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		

পাঠ ৩০ ও ৩১ : কাজ ও পেশার ক্ষেত্রে সম্মান

এসো নিচের ঘটনাগুলো পড়ি

ঘটনা ১: হাসান সাহেব গ্রামের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি। গ্রামের সবাই তাকে খুব শ্রদ্ধা করে। তিনি ছিলেন একজন কৃষক। তার তিন ছেলে। তিন ছেলেকেই তিনি লেখাপড়া করিয়েছেন। তার বড়ো ছেলে লেখাপড়া শেষ করে কৃষিকাজ করে। তিনি নিজেদের জমির পাশাপাশি অন্যের জমি বর্গা নিয়ে আবাদ করেন। মেজো ছেলে ঢাকার একটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি তাদের গ্রামের একটি হাসপাতালের ডাক্তার। আর ছোটো ছেলে লেখাপড়া শেষ করে বর্তমানে তাঁতের কাজ করেন। গ্রামের কিছু লোক হাসান সাহেবের দুই ছেলের পেশা নিয়ে ঠাট্টা করে। তারা বলে লেখাপড়া করার পরও তার দুই ছেলে কৃষিকাজ ও তাঁতের কাজ করে। ছেলেদের পেশা নিয়ে হাসান সাহেবের কোনো দুঃখ নেই, বরং তিনি আনন্দিত। কারণ তিনি জানেন সব কাজেরই আলাদা সম্মান আছে।

ঘটনা ২: কাপড় তৈরি করার জন্য সুতা বানানোর যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন আর্করাইট। ১৭৩২ সালে যুক্তরাজ্যের প্রেসটন শহরে তার জন্ম। তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তিনি কখনো বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পান নি। নিজে নিজে যা পড়েছিলেন তাই ছিল তার সম্বল। তিনি তার পরিবার চালানোর জন্য চুলকাটার দোকানে কাজ করতেন। ঐ দোকানে কাজ শিখে তিনি নিজেই একটি দোকান খুলেন ও পরচুলা লাগানোর ব্যবসায় শুরু করেন। ঐ সময় অনেকে তার এ পেশাকে নীচুশ্রেণির কাজ বলে টিটকারি করত। তিনি বলতেন কাজ যেরকমেরই হোক না কেন সেটা তো একটি কাজ। কোনো কাজই মানুষকে কখনো ছোটো করে না।

ঘটনা ৩: প্লেটো একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক। ইউরোপের গ্রিসে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তিনি আর এক বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানতাপস এরিস্টটলের শিক্ষক ছিলেন। এরিস্টটল ছোটোবেলা থেকেই প্লেটোর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। একবার প্লেটো বিশ্বকে জানতে ও জ্ঞান আহরণের জন্য বিশ্বভ্রমণে বের হলেন। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে তিনি মিসরে এসে উপস্থিত হলেন। মিসরে এসে তিনি অর্থশূন্য হয়ে পড়েন। এরপর তিনি তার পথের খরচ মেটানোর জন্য মাথায় করে মিসরের পথে পথে তেল বিক্রি করতেন। মিসরের মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাঁর একাজ দেখত। তিনি বলতেন, “উন্নত কাজ করে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায় না বরং যেকোনো কাজে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ী হলেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়”।

কাজ

তোমরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দল একটি করে গল্প পড়ে আলোচনা কর যে কেন গল্পে উল্লিখিত কাজটি অবহেলা করার মতো নয় বরং সম্মানের। আলোচনার পর প্রত্যেক দল নিজ নিজ গল্পের কাজটি যে সম্মানজনক তা ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন কর।

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনে জীবনধারণ কিংবা ভালোভাবে বাঁচার জন্য বিভিন্ন কাজ করে থাকি। কেউ বা কৃষিকাজ, তাঁতের কাজ, মুচির কাজ আবার কেউ বা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার নানান কাজ করে

থাকি। মনে রাখবে কোনো কাজই ছোটো নয়; সব কাজই সমান। সততা, ধৈর্য, মনোযোগ, নিয়মানুবর্তিতা ও দক্ষতার সাথে যে কাজই তুমি কর না কেন তা হবে অত্যন্ত সম্মানজনক এবং তাতে তুমি সফলতা লাভ করবে। কেউ যদি শ্রমিক হয় এবং সততা, নিষ্ঠা, মনোযোগ, নিয়মানুবর্তিতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করে তাহলে তা হবে সম্মানজনক। আবার কেউ যদি বড়ো কর্মকর্তা হয়েও অসততা, অবহেলা, কাজে ফাঁকি দেওয়া ও মিথ্যার আশ্রয় নেন তাহলে তা হবে অসম্মানজনক ও অমর্যাদাকর।

কাজ

প্রত্যেকে যেকোনো একটি কাজ বা পেশা চিহ্নিত কর। কাজটি যে সম্মানজনক এর পক্ষে দশটি বাক্য লেখ এবং উপস্থাপন কর।

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

পাঠ ৩২ ও ৩৩ : পরিবার ব্যতীত অন্যদের কাজ ও এর গুরুত্ব

তোমরা সকলে জানো একটি পরিবারে কত ধরনের কাজ থাকতে পারে। একটি পরিবারে যত কাজ থাকে তার সব কাজই পরিবারের সদস্যরা করতে পারেন তা নয়। অনেক কাজ আছে যেগুলো পরিবারের সদস্যরা করতে পারে না বা তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব কাজ করার জন্য পরিবারের বাইরে অন্যান্য লোকের সহায়তা নিতে হয়। সব পরিবারেই এ ধরনের অনেক কাজ আছে। নিচের ছকে এ ধরনের কী কী কাজ থাকতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ক্রম	পরিবারের বাইরে অন্যদের কাজ
১	ঘর-বাড়ি মেরামত করা /রং করা
২	জমিতে ফসল বোনা
৩	চুল কাটা.................................
৪	....
৫	....
৬	....
৭	....

তোমরা উপরের ছকে যে কাজগুলোর কথা উল্লেখ করলে সবকাজ কি সবাই করতে পারে? সবাই সব কাজ করতে পারে না। কাজ করতে দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এজন্য এসব কাজ করতে সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষ যারা তাদেরকেই আনা হয়। যেমন-ঘরবাড়ি মেরামত করার জন্য কাঠমিস্ত্রি বা রাজমিস্ত্রি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ঠিক করার জন্য বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি কিংবা গাছ কাটার জন্য গাছি, গবাদি-পশু পালনের জন্য রাখাল, ইত্যাদি তেমনিভাবে ধোপা, গোয়ালা, সংবাদপত্রের হকার, গৃহকর্মী, দিনমজুর এসকল পেশার লোকদের আমরা ডেকে থাকি। এ কাজগুলো করার জন্য আগে থেকেই লোক ঠিক করতে হয়।

কাজ
তোমরা সকলে পাঁচটি দলে ভাগ হও। পরিবারের বাইরের লোকের দ্বারা দৈনন্দিন যে কাজগুলো করা হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর। এ কাজগুলোর গুরুত্ব শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।
*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

পরিবারের যে কাজগুলো অন্যেরা করে থাকেন সেই কাজগুলো পরিবারের অন্যান্য নিয়মিত কাজের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের কাজের মধ্যে কোনো কাজ ব্যাহত হলে পরিবারের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অন্যদেরকে দিয়ে করাতে হয় এমন কাজগুলোর মধ্যে কোনোটি যদি ব্যাহত হয় তাহলেও পরিবারের বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেমন: রাখাল যদি একদিন কাজে না আসে তাহলে গবাদি-পশু লালন-পালনের কাজগুলো কে করবে? বাড়ির বৈদ্যুতিক কোনো সমস্যা হলে যদি বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি না পাওয়া যায় তাহলে অন্ধকারে থাকতে হবে, যাদের গাড়ি আছে তাদের গাড়িচালক যদি একদিন কাজে না আসে তাহলে গাড়ি চালাবে কে? আবার ডাক্তার যদি রোগীর চিকিৎসা না করেন তাহলে কী অবস্থা হবে?

কাজ
বেশিরভাগ পরিবারের সদস্যরা করে না এমন কাজে বা পেশায় নিয়োজিত একজন ব্যক্তিকে শ্রেণিকক্ষে এনে তাঁর বক্তব্য শোনা এবং শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা। শিক্ষার্থীরা পূর্বে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে।
*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে জীবনধারণের জন্য পরিবারের বাইরে অন্যরা করে এমন সব কাজেরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং যে ধরনের কাজ হোক না কেন কাজগুলোর ক্ষেত্রে অবহেলা বা গড়িমসি করা ঠিক নয়।

পাঠ ৩৪ - ৩৭ : কাজ ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব

মানুষ তার জীবিকা নির্বাহ ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। প্রত্যেক মানুষ তার দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী নানান ধরনের পেশা ও কাজে নিয়োজিত হন। একেক জনের কাজ একেক ধরনের। আমাদের জীবনে প্রত্যেক কাজেরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। ছোটো কাজ বা বড়ো কাজ বলে যেমন কিছু নেই, তেমনি উঁচু কাজ বা নীচু কাজ বলেও কোনো কিছু নেই। যারা বিভিন্ন ধরনের কাজ বা পেশায় নিয়োজিত তাদের প্রতি সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য। তারা তাদের কাজের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করছেন। কৃষক যদি ফসল না ফলান, ভ্যানচালক যদি তার ভ্যানের মাধ্যমে পণ্য আনা-নেওয়া না করেন, ডাক্তার যদি চিকিৎসা না করেন, রিকশাচালক যদি রিকশা না চালান, কুলি পণ্য বহন না করেন, দোকানদার যদি দোকান বন্ধ রাখেন, জেলে যদি মাছ না ধরেন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী যদি রাস্তা পরিষ্কার না করেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি তাদের দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে কী হবে? দেশ অচল হয়ে যাবে, আমাদেরও বেঁচে থাকা কঠিন হবে। সুতরাং এসকল কাজে নিয়োজিতদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এবার আমরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানব :

সব কাজই সমান : যে যে কাজই করুক না কেন সব কাজই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরিশ্রম, মর্যাদা, আর্থিক মূল্য, দক্ষতার ব্যবহারসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করলে সব কাজকে সমানভাবে দেখা এবং সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

সবার ভূমিকা সমান : দেশের উন্নয়নে সকল পেশার মানুষের ভূমিকা সমান। শ্রমিক থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সবাই যার যার কাজের মাধ্যমে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ ও সচল রেখেছেন। এদের কেউ যদি তাদের কাজ বন্ধ রাখেন তাহলে আমরা প্রতিদিন অসুবিধায় পড়ব। এজন্য সকল পেশার মানুষকে সম্মান জানানো উচিত।

উন্নয়নের অংশীদার : যত ধরনের কাজ ও পেশা আমাদের দেশে রয়েছে তার সবগুলোই দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে। কোনো একটি পেশার মানুষ যদি কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে উন্নয়ন থমকে যাবে। যেমন : কৃষক যদি উৎপাদন বন্ধ করে তাহলে খাদ্যের সমস্যা দেখা দিবে। ভ্যানচালক যদি পণ্য পরিবহন বন্ধ রাখেন তাহলে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রমিক যদি বিভিন্ন কল-কারখানায় কাজ না করেন তাহলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য সব পেশার মানুষকে সম্মান জানাতে হবে।

পেশায় শ্রমের গুরুত্ব : সব ধরনের কাজ ও পেশায় পরিশ্রম আছে। কেউ করেন শারীরিক পরিশ্রম, কেউ করেন মানসিক পরিশ্রম আবার কেউবা শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের শ্রমই দিয়ে থাকেন। কোনো ধরনের কাজই শ্রম ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এজন্য সকল ধরনের পেশাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

মজবুত অর্থনীতি ও সমৃদ্ধ দেশ : দেশের মানুষ তাদের কাজের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছেন। প্রত্যেকে স্ব স্ব পেশা ও কাজের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধ করছেন। এক্ষেত্রে কে কোন পেশায় আছেন সেটি মূলকথা নয় বরং প্রত্যেকেই নিজের পেশায় থেকে শ্রম দিয়ে অর্থনীতিকে বেগবান করছেন। এজন্য সব পেশাকেই সমান মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা উচিত।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি : যারা যে পেশায় আছেন বা শ্রম দিচ্ছেন প্রত্যেকেই নিজে পেশার একজন দক্ষ শ্রমিক। চাই সেটা মানসিক হোক অথবা শারীরিক হোক না কেন উত্তরোত্তর কাজ করার কারণে তারা নিজেদের পেশায় যেমন আরও দক্ষ হয়ে উঠেছেন তেমনি তাদের দক্ষতা নতুনদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এজন্য প্রত্যেক পেশাকেই সম্মান করা দরকার।

শ্রম বিভাজন : এক একজন একেক পেশায় জড়িত হওয়ায় শ্রমের বিভাজন ঘটেছে। সবাই যদি একই কাজ করে বা করতে চায় তাহলে অন্য কাজগুলো কে করবে? এছাড়া সব পেশায় যদি মানুষ জড়িত না হয় তাহলে অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে। এজন্য সব পেশাকে সম্মান জানাতে হবে যাতে মানুষ সব ধরনের পেশায় জড়িত হতে পারে।

সামাজিক ভারসাম্য : বিভিন্ন কাজ বা পেশায় জড়িত হওয়ার ফলে মানুষের পরিবারে যেমন স্বচ্ছলতা আসছে তেমনি সমাজের ভারসাম্য তৈরি হচ্ছে। সমাজে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি

২০২৫

গড়ে উঠছে। সবাই সচেতনতা ও আত্মমর্যাদার সাথে নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকে। তারা নিজেদের অধিকারের বিষয়ে যেমনি সচেতন থাকে ঠিক তেমনিভাবে অন্যদের অধিকারের ব্যাপারেও সচেতন থাকে। সমাজের ভারসাম্যতার জন্য সব ধরনের পেশাকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে।

কাজ

দলগত কাজ

কাজ ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব বিষয়ে পোস্টার লিখে তা শ্রেণিতে প্রদর্শন।

*এ কাজে দুটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিজের কাজ নিজে করলে-

ক. নিজের মনের মতো কাজ করা যায় খ. অর্থ ব্যয় হয়

গ. কাজটি দায়সারা গোছের হয় ঘ. সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়

২. পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে প্রধানত আমাদের কোন ধরনের অধিকারগুলো পূরণ হয়ে থাকে?

ক. সামাজিক খ. রাজনৈতিক

গ. মৌলিক ঘ. সাংস্কৃতিক

৩. নিচের কোন খাতের ব্যয়টি পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ সংক্রান্ত ব্যয়ের **অন্তর্ভুক্ত নয়?**

ক. খাদ্য খ. পোশাক

গ. চিকিৎসা ঘ. সঞ্চয়

৪. নিচের কোন কাজটি সাধারণত পরিবারের বাইরের কারো দ্বারা করানো হয়?

ক. রান্না করা খ. চুল কাটা

গ. কাপড় ধোয়া ঘ. বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করা

৫. বৈচিত্র্যময় পেশায় আমাদের অংশগ্রহণের ফলে-

i. সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা হয়

ii. পরিবারে স্বচ্ছলতা আসে

iii. শ্রমের বিভাজন ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. ii ও iii ঘ. i. ii ও iii

২০২৫

সৃজনশীল প্রশ্ন

গ্রামের সকলেই আলম সাহেবকে শ্রদ্ধা করে। তিনি পেশায় কৃষক। তিনি তার একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে খুবই সচেষ্ট। এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় তিনি তার ছেলেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিশারিজ বিভাগে লেখাপড়া করতে পাঠান। লেখাপড়া শেষে তিনি তার ছেলেকে নিজের তিনটি পুকুরের পাশাপাশি আরও কয়েকটি পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করতে দিলেন। এজন্য গ্রামবাসীদের কেউ কেউ তার ছেলেকে বিদ্রুপ করলেও আলম সাহেব তাঁর ছেলের পেশায় খুবই গর্বিত।

ক. পেশা কী?

খ. মানুষ কাজ করে কেন?

গ. গ্রামের কিছুলোক আলম সাহেবের ছেলেকে ঠাট্টা করে কেন? বর্ণনা কর।

ঘ. ছেলের পেশা নিয়ে আলম সাহেবের খুশি হওয়ার বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মক্ষেত্রে সফলতা

আমরা শিক্ষার্থী হিসেবে সফল হবার উপায় জেনেছি। জেনেছি নিজের জীবনের প্রাত্যহিক কাজের কথা। তোমরা এখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ছ। এর পরে নিশ্চয়ই অষ্টম শ্রেণিতে পড়বে। এভাবে একদিন হয়ত বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে কেউ কলেজে, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে, কেউবা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করবে। একসময় পড়া শেষে তোমরা হয়ত কোনো পেশায় অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছো কী ধরনের কাজ বা পেশা তোমাদের পছন্দ? এই পেশায় যেতে হলে তোমাদেরকে কী কী পড়তে হবে? কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে হবে? এবারে এসো আমরা দেখি পড়ালেখা শিখে কীভাবে আমরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারি। শুধু তা-ই নয়, আমরা আরও খুঁজে বের করবো কর্মক্ষেত্রে সফল হবার গুণগুলো।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- পরবর্তী শিক্ষাস্তরের বিভিন্ন শাখা ও বিষয়সমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভে আগ্রহী হবো।
- শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভের উপায় নিয়ে একটি পোস্টার ডিজাইন করে প্রদর্শন করতে পারব।

পাঠ ৩৮ : লেখাপড়া করে সফল হতে চাই : কোন পথে যাব?

রাশেদ আর ইভা অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী । এসো দেখি তারা কী নিয়ে আলোচনা করছে ।

ইভা : এই রাশেদ, কোথায় যাচ্ছো? তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে যে !

রাশেদ : খুবই চিন্তায় আছি ইভা । চাচার বাড়ি যাচ্ছি, চাচা-চাচির সাথে একটি বিষয়ে আলোচনা করতে ।

ইভা : ও আচ্ছা! কী বিষয় জানতে পারি?

রাশেদ : নিশ্চয়ই । অষ্টম শ্রেণিতো প্রায় শেষ হয়ে এলো। সামনের বছরেই তো আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন শাখায় পড়ব – বিজ্ঞান, মানবিক, নাকি ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় । ইভা, তুমি কোন শাখায় পড়বে?

ইভা : আমি ঠিক করেছি মানবিক শাখায় পড়াশোনা করব। আমার এ বিষয়ে বেশ আগ্রহ আছে । দিনার কথা মনে আছে, সে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় কাঠ দিয়ে চমৎকার সব জিনিস বানাতো?

রাশেদ : হ্যাঁ, কিন্তু তাকে তো আমাদের স্কুলে দেখি না ।

ইভা : সে অষ্টম শ্রেণি শেষ করে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পড়ছে । কারণ তার হাতে-কলমে কাজ করতে খুব ভালো লাগে। আর ভবিষ্যতেও সে এমন কাজ করে উপার্জন করতে চায় যেখানে হাতে-কলমে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে । তোমার নিজের কোনো আগ্রহ নেই কোনো বিষয়ে?

রাশেদ : আমি ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পড়তে চাই । কিন্তু আমার বাবা-মার ইচ্ছা আমি বড়ো হয়ে ডাক্তার হই। তাই তাঁরা চান যেন আমি বিজ্ঞান শাখায় পড়ি ।

ইভা : তুমি কেন ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পড়তে চাও? তুমি ভবিষ্যতে কী হতে চাও?

রাশেদ : আ....আ.......ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের পড়াশোনা আমার বেশ সহজ মনে হয় তাই । কিন্তু কী হতে চাই তাতো চিন্তা করি নি ।

ইভা : কিন্তু তুমি কোন শাখায় পড়বে তা ঠিক করার আগে তোমার অনেক কিছুই চিন্তা করা উচিত। আমার বোন শাহিদার স্বপ্ন ছিল তিনি প্রকৌশলী হবেন । কিন্তু আমাদের পরিবারের লোকজন ভেবেছিলেন মেয়েদের জন্য মানবিক শাখাই বেশি উপযুক্ত হবে । তাই তিনি মানবিক শাখা বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু তারই এক বান্ধবী তখন বিজ্ঞান শাখায় পড়েছিলেন । এখন তিনি প্রকৌশলী । শাহিদা এখনও দুঃখ করে বলে, 'তখন যদি ভালো করে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতাম, তবে হয়ত আমার স্বপ্নটাও পূরণ হতো' ।

রাশেদ : তুমি ঠিকই বলেছো ইভা । আমি এখন সব বিষয় ভালো করে চিন্তা করে তবেই সিদ্ধান্ত নিবো ।

পাঠ ৩৯ ও ৪০ : শিক্ষাক্ষেত্রে শাখা নির্বাচন

কাজ

এসো দলে বসে নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করি।

১. ভবিষ্যৎ পেশা নির্ধারণে পড়ালেখার শাখা নির্বাচনের প্রভাব কী? তোমার আশপাশের মানুষ থেকে একজন প্রকৌশলী, ডাক্তার, কাঠমিস্ত্রী, নার্স, ব্যবসায়ী বা শিক্ষক-যেকোনো নির্দিষ্ট পেশার মানুষের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরে উদাহরণ দাও। একেক জন একেক ধরনের পেশার মানুষের অভিজ্ঞতা তুলে ধর ।

২. শিক্ষার্থী কোন শাখায় পড়বে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে কোন কোন বিষয়ে চিন্তা করা উচিত?

৩. এবারে প্রত্যেক দল ক্লাসের সবার সামনে তা উপস্থাপন করো।

আজকের এই ক্লাসে আমরা বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক শাখা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারার মোট চার জন শিক্ষার্থীকে আমাদের শ্রেণিকক্ষে আমন্ত্রণ জানাব। আমরা চাই এই ধারা এবং শাখাগুলো সম্পর্কে জানতে ।

দলগত কাজ

চলো আমরা সবাই চারটি দলে ভাগ হই। প্রতি দলে সবাই গোল হয়ে বসি আর আমন্ত্রিত একজন শিক্ষার্থী বড়ো ভাই বা বড়ো আপাকে মধ্যখানে বসাই। এবারে আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিই তিনি যে শাখায় বা ধারায় পড়ছেন সেটি সম্পর্কে। কেন তিনি এই শাখায় পড়ছেন তাও জেনে নিই। নিচের বিষয়গুলো যেন আমাদের আলোচনা থেকে বাদ না পড়ে যায় সে বিষয়ে লক্ষ রাখি আর প্রয়োজনীয় তথ্য সংক্ষেপে একজন খাতায় লিখে রাখি।

১. এই শাখা/ধারায় পড়ার জন্য তাদের কোনো যোগ্যতা বা পূর্বশর্ত পূরণ করতে হয়েছিল কি? হলে সেটি বা সেগুলো কী?

২. এই শাখা/ধারায় কী কী বিষয় পড়তে হয়? সংক্ষেপে বিষয়গুলোর বর্ণনা।

৩. এই শাখা/ধারার পড়ালেখা শেষ করে তিনি ভবিষ্যতে কী পড়তে চান? কী কী বিষয়ে পড়ার সুযোগ তার আছে?

৪. এই শাখা/ধারায় পড়ালেখা শেষে তিনি কী হতে চান? আর কী কী পেশায় যাওয়ার সুযোগ তার রয়েছে?

৫. আপনি কি কখনো ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন? করে থাকলে আমাদের বলবেন কি?

* এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

আলোচনা শেষে প্রত্যেক দল চারটি ছোট পোস্টার পেপারে সেই নির্দিষ্ট শাখা/ধারা সংক্রান্ত উপর্যুক্ত চারটি বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরি। এবারে যার যার দলের পোস্টারগুলো শ্রেণিকক্ষের এক এক কোণে টাঙিয়ে দিই। এরপর একটি নির্দিষ্ট দলের পোস্টারগুলো বাকি তিন দলের সদস্যরা মিলে ঘুরে ঘুরে দেখি। তখন সেই দলটি অন্য দলের সদস্যদের পোস্টারে লেখা বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ করে বোঝাবে। আলোচনার ফলাফল লিপিবদ্ধ করার জন্য বা পোস্টারে উপস্থাপন করার জন্য এই ধরনের একটি ছক ব্যবহার করা যেতে পারে।

২০২৫

শিক্ষার ধারা	শাখা/ বিভাগ	যেসব বিষয়ে পড়তে হয়	যে সকল পেশা/বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ রয়েছে
সাধারণ শিক্ষা	বিজ্ঞান শাখা		
	মানবিক শাখা		
	ব্যবসায় শিক্ষা শাখা		
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা			

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

পাঠ ৪১ : পেশাগত জীবনে শিক্ষা জীবনের প্রভাব

সাংবাদিক জুঁই!

ছোটোবেলা থেকেই জুঁই এর সবচেয়ে পছন্দের কাজ ছিল টিভিতে সংবাদ দেখা। দেশ বিদেশের খবর জানতে তার খুবই ভালো লাগে। ঘরে বসেই কতো না খবরাখবর জানা যায়। এজন্যই ছোটোবেলা থেকেই তার ইচ্ছা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নেওয়া। তার ইচ্ছা তিনি মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছে দিবেন। এজন্য তিনি প্রথম থেকেই পরিকল্পনা করেছেন ভবিষ্যতে তিনি কোন শাখায় পড়বেন, কোন বিষয়ে পড়বেন। তিনি মানবিক শাখা নির্বাচন করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাংবাদিকতা' বিষয় বেছে নেন পড়ার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি দেখেছেন অনেকেই না বুঝে পড়া মুখস্থ করে। কিন্তু তিনি বরাবরই বুঝে পড়তেন। তাতে তিনি পড়ায় আনন্দও খুঁজে পেতেন। আজ তিনি বিখ্যাত সাংবাদিক। সবাই তাকে চেনে, শ্রদ্ধা করে। তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং তা খুব চমৎকারভাবে সরাসরি টিভিতে সম্প্রচার করা হয়।

তার বন্ধু শিলুও সাংবাদিক। তিনি একদিন জুঁইকে ফোন করে বললেন, নারে, তুইই ঠিক কাজ করেছিলি। আমি না বুঝে মুখস্থ করেছি। যা পড়েছি তা এখন কাজে লাগাতে পারছি না। চেষ্টা করেও এখন ভালো সাংবাদিক হতে পারছি না। মনে মনে বলি, 'তখন যদি জুঁই এর মতো মনোযোগ দিয়ে বুঝে পড়ার চেষ্টা করতাম!'

জোড়ায় কাজ

- এসো আমরা পাশাপাশি দুজনে মিলে প্রথমে উপরের গল্পটি পড়ি। এবারে নিচের ধারণাচিত্রটি প্রয়োজনীয় ধারণা/শব্দ বসিয়ে খাতায় পূরণ করি।

জুঁই এর শিক্ষা জীবন ও পেশায় প্রবেশের ধাপ

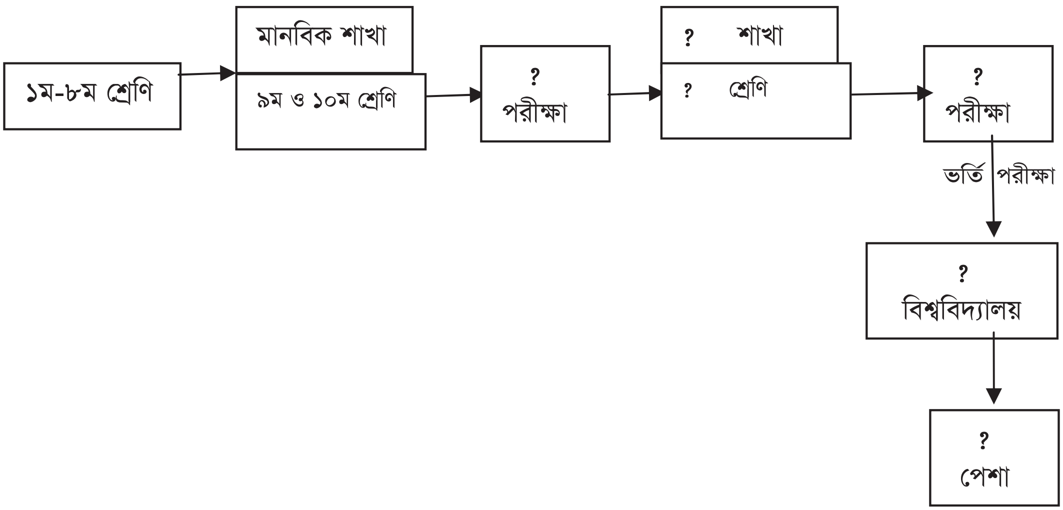

- **এসো বন্ধুর সাথে আলোচনা করিঃ** জুঁই এর শিক্ষা জীবনের চর্চা কীভাবে তার পেশাগত সফলতাকে প্রভাবিত করেছে?

মানুষ জীবনযাপন, আত্মমর্যাদাবোধ, দক্ষতা উন্নয়ন, আত্মতৃপ্তি ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তি বেছে নেয়। যেমনঃ কেউ শিক্ষকতা করেন, কেউ হন স্থপতি। তাঁরা বিভিন্ন দালানকোঠা ও অন্যান্য জিনিসের নকশা করেন। কেউ হন কাঠ মিস্ত্রি, যিনি কাঠ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানান। এই যে একেক জন মানুষের একেক পেশা বা বৃত্তি, তাদের এই কাজগুলো করার জন্য দরকার হয় সেই বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। যেমনঃ যিনি ইংরেজির শিক্ষক তাকে ইংরেজি ভাষা ভালো করে রপ্ত করতে হবে, জানতে হবে কী কী বিষয় পড়াতে হবে, কীভাবে পড়াতে হবে ইত্যাদি। আবার যিনি স্থপতি তার জানতে হবে কীভাবে ঘর বাড়ির নক্‌শা তৈরি করা যায়। আসলে সব মানুষের তো আর সব বিষয় জানার দরকার হয় না, এতো কিছু জানা সম্ভবও নয়। তাই সে যে পেশা বা বৃত্তিতে যাবে সেটি ভালোভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আর দক্ষতাটি অন্তত তার থাকা প্রয়োজন। বলতে পারো এটি কীভাবে মানুষ অর্জন করতে পারে? পড়াশোনা হলো একটি উপায় যার মধ্য দিয়ে মানুষ বিভিন্ন বিষয় জানতে পারে, বুঝতে পারে, ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে। তাই পড়ালেখা ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা পরস্পর নির্ভরশীল।

পাঠ ৪২ : শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শাখা

এসো এবারে আমরা শিক্ষার উচ্চতর স্তর ও বিভিন্ন শাখাগুলো সম্পর্কে জানি ।

আমাদের দেশে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্তরকে আমরা বর্তমানে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর বলে থাকি । প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক । শুধু তা-ই নয়, সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছে । প্রাথমিক স্তর শেষ করে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণির পর শিশুরা একটি পরীক্ষা দেয় । এটি হলো প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা । এটি পাশ করার পর শিশু ভর্তি হয় ষষ্ঠ শ্রেণিতে । তার পর সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি। নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে সাধারণ ধারার শিক্ষায় পড়াশোনা করতে পারে অথবা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় যেতে পারে। সাধারণ ধারায় পড়লে নবম শ্রেণিতে সে বিজ্ঞান, মানবিক অথবা ব্যবসায় শিক্ষা এই তিনটি শাখার যেকোনো একটিতে যেতে পারে । সে কোনো শাখায়/ধারায় পড়বে তার উপর তার ভবিষ্যতের উচ্চশিক্ষা আর পেশা ও বৃত্তি নির্বাচন নির্ভর করবে । এছাড়া অষ্টম শ্রেণি, দশম শ্রেণি এবং দ্বাদশ শ্রেণি শেষে দেশের সব শিক্ষার্থীদের একটি করে পাবলিক পরীক্ষা দিতে হয় । জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী নিচে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলো দেখানো হলো:-

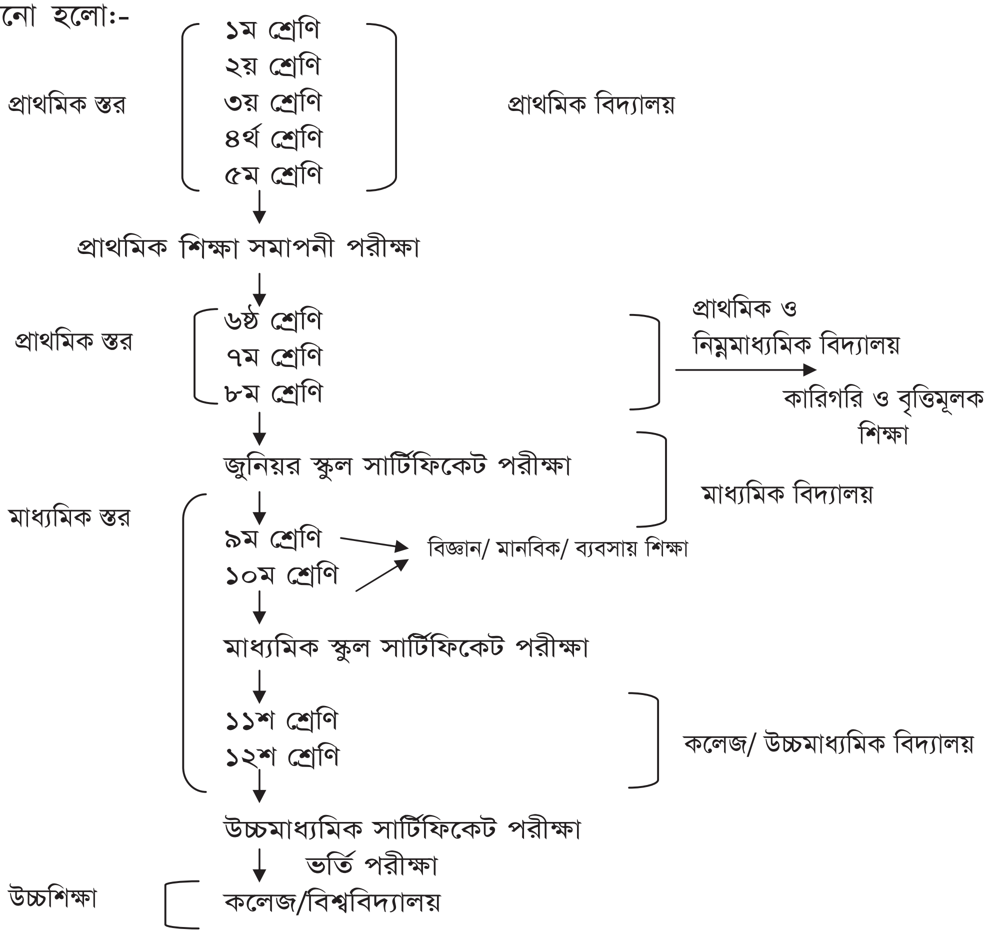

পাঠ ৪৩ - ৪৭ : শাখা ও পেশা নির্বাচন

আমরা দেখেছি যে আমাদের পেশা নির্বাচন ও আমাদের শিক্ষা জীবনের শাখা নির্বাচন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এসো আমরা এ বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করি ।

দলগত কাজ

বিতর্কের জন্য আলোচনা

আমরা শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী দুটি দলে ভাগ হই। প্রতিটি দলের জন্য একটি বিতর্কের বিষয় লটারি করে নির্বাচন করি । এবার প্রতিটি দল আবার ‘পক্ষ’ ও ‘বিপক্ষ’- এ দুটি দলে বিভক্ত হই । প্রতিটি দল আলাদাভাবে বসে তাদের বিষয়টির পক্ষে/বিপক্ষে যুক্তিগুলো আলোচনা করে লিখে রাখব। এবারে দল থেকে তিন জন বক্তা ঠিক করি যারা এ সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন করতে পারবে । এছাড়া বিতর্কের মূল্যায়ন বা বিচারের জন্য একটি মানদণ্ড তৈরি করতে হবে। সেটি এরকম হতে পারে:

দল	বক্তা	উপস্থাপন কৌশল (৫)	বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ (৫)	যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা (৫)	যুক্তি খণ্ডন (৫)	তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যবহার (৫)	মোট নম্বর (২৫)
পক্ষ	বক্তা -১						
	বক্তা -২						
	বক্তা -৩						
	‘পক্ষ’ দলের মোট নম্বর:						
বিপক্ষ	বক্তা -১						
	বক্তা -২						
	বক্তা -৩						
	‘বিপক্ষ’ দলের মোট নম্বর:						

* এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে ।

বিতর্কের বিষয় ১

'পেশার কথা চিন্তা করে শিক্ষার শাখা নির্বাচন নয় বরং শিক্ষার শাখা নির্বাচন করে সেই অনুযায়ী পেশা নির্বাচন করা জরুরি'।

*এ বিতর্কে দুটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

বিতর্কের বিষয় ২

'নিজের যোগ্যতা নয় বরং শাখা নির্বাচনের সময় নিজের আগ্রহকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।'

*এ বিতর্কে দুটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বিষয়-১	পক্ষ	দল-১	৩ জন ৫ মিনিট করে = ১৫ মিনিট	উভয় দল থেকে দলনেতা ৩ মিনিট যুক্তি খণ্ডনের জন্য পাবেন
	বিপক্ষ	দল-২	৩ জন ৫ মিনিট করে = ১৫ মিনিট	
বিষয়-২	পক্ষ	দল-৩	৩ জন ৫ মিনিট করে = ১৫ মিনিট	উভয় দল থেকে দলনেতা ৩ মিনিট যুক্তি খণ্ডনের জন্য পাবেন
	বিপক্ষ	দল-৪	৩ জন ৫ মিনিট করে = ১৫ মিনিট	

বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য তোমরা উপরের সময়সূচিটি মেনে চলতে পার অথবা তোমাদের ক্লাসের সময়সূচি অনুযায়ী কিছু পরিবর্তন করে নিতে পার। যেদিন দল ১ ও ২ বিতর্কে অংশ নিবে সেদিন দল ৩, ৪ এর সদস্যদের মধ্য থেকে ১জন সময় সতর্ককারী এবং ৫জন বিচারক (শিক্ষকসহ) এবং ৬জন হিসাবকারী হিসেবে কাজ করবে।

সময় সতর্ককারীর কাজ

সময় লক্ষ করে ঘণ্টা বাজিয়ে বিতার্কিকদের সতর্ক করে দিবে। সে প্রত্যেক বিতার্কিকের সময় শেষ হবার ১ মিনিট আগে ও সময় শেষ হবার সাথে সাথে ঘণ্টা বাজাবে। কাজটি সে করবে মনোযোগসহ ঘড়ির কাঁটা লক্ষ করে।

বিচারকের কাজ

শিক্ষকসহ পাঁচ জন বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বিচারকদের প্রত্যেকের কাছে কাগজ থাকবে যেখানে তিনি পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রত্যেক বিতার্কিককে নম্বর দিবেন।

হিসাবকারীর কাজ

পাঁচজন বিচারক একেকজন একেক হিসাবকারীকে তাদের প্রদত্ত নম্বরগুলো হিসেবের জন্য দিবেন। প্রত্যেক হিসাবকারী বিচারকের দেওয়া নম্বরগুলো যোগ করে প্রত্যেক বিতার্কিকের প্রাপ্ত নম্বর এবং দলের নম্বর হিসেব করবেন । এবারে একজন চূড়ান্ত হিসাবকারী প্রত্যেক বিতার্কিককে দেওয়া পাঁচ জন বিচারকের নম্বর যোগ করে ৫ দিয়ে ভাগ করে প্রত্যেক দলের গড় নম্বর হিসেব করবে । হিসেব শেষে তা শিক্ষককে দেওয়া হবে । তিনি ফলাফল ঘোষণা করবেন ।

পাঠ ৪৮ - ৫০ : শিক্ষায় শাখা/ধারা নির্বাচনে যেসকল বিষয় বিবেচনা করা দরকার

আমরা যদি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে চিন্তা করি তবে আমাদের তিন টি ধাপে চিন্তা করলে সুবিধা হয় ।

ধাপ ১

নিজেকে জানা

কে এই 'আমি'?

প্রথমেই নিজের আগ্রহ, পছন্দ, অপছন্দ, সবল ও দুর্বল দিক, অর্জনসমূহ, মূল্যবোধ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালোভাবে জানার চেষ্টা করতে হবে ।

জোড়ায় কাজ

এসো নিজের 'আগ্রহ' জানি

তোমার পছন্দের ১০টি কাজের একটি তালিকা তৈরি কর। তার পাশের কলাম বরাবর এটি করতে কোন কোন মানুষ বা কী কী জিনিস দরকার হয় তা লিখ। এটি তুমি গত এক মাসে কতবার করেছো তা উল্লেখ কর তার পাশের কলামে। এবারে ছকটি পড়ে তোমার কী মনে হচ্ছে? তোমার আগ্রহ অনুযায়ী কী কী পেশা তোমার জন্য উপযুক্ত হবে তার তালিকা তৈরি কর ।

পছন্দের কাজ	যেসব জিনিস বা যন্ত্রের প্রয়োজন	গত ১ মাসে যতবার কাজটি করেছি	কাজটি কোন ধরনের (একাধিক ধরন হতে পারে)*
ছবি আঁকা	রং, তুলি, কাগজ, পেনসিল, রাবার	৬/৭ বার	যন্ত্র বা জিনিসপত্র নিয়ে কাজ

২০২৫

* তথ্য ও ধারণা নিয়ে কাজ
* মানুষের সাথে কাজ
* যন্ত্র বা জিনিসপত্র নিয়ে কাজ
* এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

ধাপ ২

কর্ম বা পেশা ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় জানা

আমি কোন পথে চলেছি?

এবারে আমাদের জানতে হবে ভবিষ্যতে আমার শিক্ষা ক্ষেত্রে কী ধরনের সুযোগ রয়েছে, শিক্ষা শেষে কর্ম বা পেশার কী কী সুযোগ রয়েছে?

একক ও জোড়ায় কাজ

'যখন আমার বয়স ৩০'

কল্পনা কর 'যখন আমার বয়স ৩০ তখন আমি নিজেকে কী অবস্থায় দেখতে চাই?'। মনে কর ৩০ বছর বয়সে তুমি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেছ। এবার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর এবং এর ভিত্তিতে একটি ছোটো লেখা লিখ।

ক) তুমি কোন শহরে/দেশে বাস করছ?
(ঢাকা, বাংলাদেশ/নিউইয়র্ক, আমেরিকা ...)

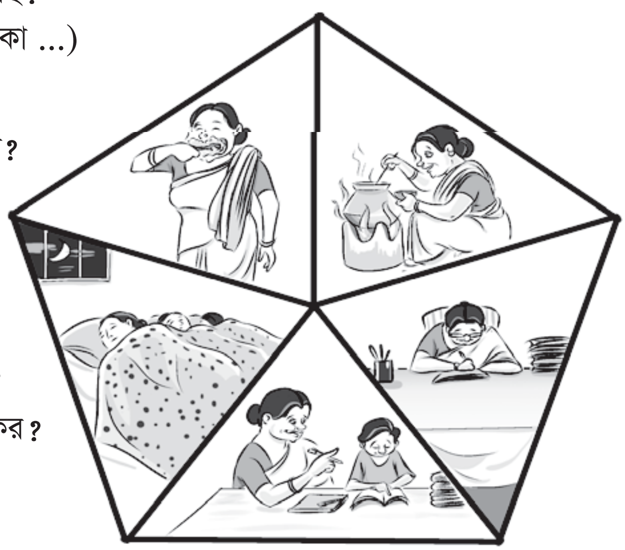

খ) তুমি কোন ধরনের বাসায় থাক?

গ) তোমার সাথে আর কে কে আছেন?
(বাবা/মা/ স্বামী/স্ত্রী/ছেলে/মেয়ে/ আত্মীয়/ বন্ধু ...)

ঘ) তুমি কোন ধরনের কাজ বা পেশায় নিয়োজিত?

ঙ) তোমার কাজের পোশাকটি কী রকম?

চ) তুমি প্রতিদিন কখন/কতক্ষণ কাজ কর?
(সকাল থেকে সন্ধ্যা, ৯-৫টা ...)

ছ) তোমার কাজের স্থানটি কোথায়? সেখানে তুমি কীভাবে যাও?

জ) সেখানে তুমি কী ধরনের কাজ কর? (যেমন- লেখার কাজ/কম্পিউটারে কাজ/মানুষের সাথে বসে আলোচনা...)

ঝ) কাজ শেষে বাসায় ফিরে অবসরে কী কর? (টেলিভিশন দেখা, মাছ ধরা....)

ঞ) কোনো একটি দিনের ঘটে যাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার বর্ণনা দাও।

* এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

ধাপ ৩

কর্ম বা পেশা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আমি কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি?

একক ও জোড়ায় কাজ : এক বন্ধু আরেক বন্ধুর সাক্ষাৎকার নাও এবং সংক্ষেপে নোট রাখ।

১. তোমার আগ্রহের বিষয় কী?

২. তোমার কী কী ধরনের দক্ষতা ও গুণ রয়েছে?

৩. তোমার কী কী বিষয় ভালো লাগে?

৪. তোমার কী কী বিষয় অপছন্দ?

৫. তোমার স্বপ্নের পেশার সাথে এসব কল্পনা কতটুকু সংশ্লিষ্ট?

*এ কাজে একটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

মনে রাখা প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত এমন নয় যা কোনোভাবে পরিবর্তন করা যাবে না। বরং সময়ের সাথে সাথে আগ্রহ, ইচ্ছা, চাহিদা ইত্যাদির পরিবর্তনে এই সিদ্ধান্তও বদলাতে পারে। তবে সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। শিক্ষায় নির্দিষ্ট স্তরে শাখা নির্বাচন করলে আমাদের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ ঘটে। আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

পাঠ ৫১ - ৫৪ : উচ্চশিক্ষার পথ

ছোটো দলে কাজ: নিচে উচ্চ শিক্ষার কিছু বিষয়বস্তু এবং কিছু পেশার নাম দেওয়া হয়েছে। তোমার জানা উচ্চশিক্ষার অন্যান্য বিষয় এবং তোমার চেনাজানা অন্যান্য পেশার নামও তালিকায় যোগ করতে পার। কোন কোন শাখার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে/কলেজে কোন কোন বিষয় পড়তে পারবে তা তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাও। আবার শিক্ষার্থীরা সে বিষয়গুলো পড়ে কোন কোন পেশায় যেতে পারবে তাও তীর চিহ্ন দিয়ে দেখাও। শিক্ষক বোর্ডে কাজটি করার পরে নিজেদের করা কাজ মিলিয়ে নাও।

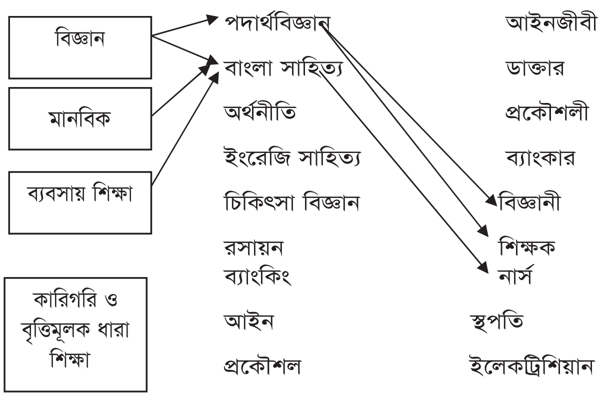

লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ

আজকে শ্রেণিকক্ষে আমরা স্কুলের প্রাক্তন দুজন শিক্ষার্থীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। নিচের প্রশ্নপত্র অনুসরণ করে আমরা তাঁদের সাক্ষাৎকার নিতে পারি।

১. আপনি যখন শিক্ষার্থী ছিলেন তখন আপনার প্রিয় বিষয়গুলো কী ছিল?

২. আপনি কোন শাখা নির্বাচন করেছিলেন? কেন?

৩. কোনটি আপনার স্বপ্নের পেশা ছিল? আপনি কীভাবে এই পেশায় এলেন?

৪. আপনার মতে শাখা নির্বাচন বা পেশা নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা উচিত?

৫. আপনার জীবনে এমন কোনো ঘটনা বা গল্প আছে কি যা আপনাকে শাখা বা ধারা নির্বাচনে প্রভাবিত করেছে? থাকলে সেগুলো কী?

৬. আপনার জীবনে এসকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কে/কারা সাহায্য করেছেন? কীভাবে?

৭. আপনি কি কখনো ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন? করে থাকলে তা আমাদের বলবেন কি?

সাগর ও তার মা

সাগর খুব চঞ্চল। তার দুষ্টুমিতে সারা গ্রামের লোক ব্যতিব্যস্ত। আজকে এর গাছের আম পাড়ে তো কাল অন্যজনের পোষা পাখি উড়িয়ে দেয়। দুষ্টু হলেও সে ছিল খুবই মা ভক্ত। মার জন্য তার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার কোনো শেষ নেই। সে বড়ো হতে থাকে কিন্তু পড়ালেখায় তার একদমই মনোযোগ নেই। মন শুধু দুষ্টুমিতে ভরা। সে যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, তখন হঠাৎই তার মায়ের মারাত্মক এক রোগ ধরা পড়ে। অনেক চেষ্টা করে ডাক্তার তার মাকে সুস্থ করে তুলেন। সেই থেকে সাগরের কী যে হলো! দুষ্টুমি বন্ধ করে পড়ালেখায় খুব মনোযোগী হলো সে। সে বলল, আমি ডাক্তার হব। অনেক মানুষের মাকে সুস্থ করে তুলব।

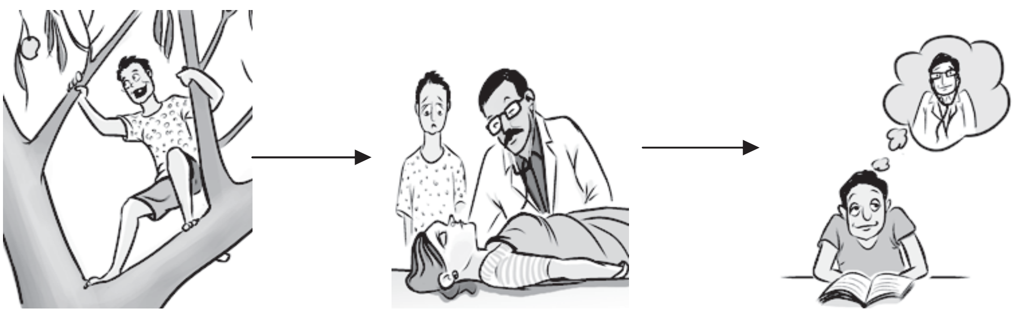

দেখলেতো সাগরের ঘটনাটি। এরকম অনেক ঘটনা বা চিন্তাভাবনা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে প্রভাবিত করে।

২০২৫

পাঠ ৫৫-৭০ : কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য দরকার

একেক ধরনের কাজ করতে একেক ধরনের যোগ্যতা, দক্ষতা দরকার হয় । তবে কিছু সাধারণ দক্ষতা বা গুণ আছে যেগুলো যেকোনো পেশাতেই সফল হবার জন্য দরকার পড়ে । তোমরা কি এই দক্ষতা বা গুণগুলো চিন্তা করে বের করতে পারবে?

কাজ

এসো দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দলে কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার গুণগুলো খুঁজে বের করি এবং খাতায় লিখি।

এবার এগুলো শ্রেণিতে উপস্থাপন কর এবং অন্য দলের উপস্থাপিত যে গুণগুলো তোমার খাতায় লেখা নেই সেগুলো যোগ কর ।

কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি

- নিজের শেখা জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারা
- জটিল চিন্তন দক্ষতা (যেমন- তুলনা করা, মূল্যায়ন করা, বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি)
- অন্যের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারা
- অন্যদের সাথে একত্রে কাজ করতে পারার ক্ষমতা
- নিজেদের চিন্তাধারা, আচরণ, আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ
- নতুন কিছু সৃষ্টি করার দক্ষতা
- পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা
- নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা
- প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা
- সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা
- বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা করতে পারা
- সময়নিষ্ঠ হওয়া
- কর্মক্ষেত্রের মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা
- কাজ ও অভিজ্ঞতা থেকে শেখার প্রবণতা
- দায়িত্ববোধসম্পন্ন হওয়া
- ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা
- জানার আগ্রহ
- একা কাজ করতে পারার ক্ষমতা
- প্রয়োজনে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা
- নিজের আচরণ, আবেগ ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ।

এখানে পেশাগত জীবনে সফল হবার জন্য কিছু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তোমরা সবাই কয়েকটি দলে ভাগ হও। এবারে তোমরা প্রত্যেক দল উপরের তালিকা থেকে কয়েকটি গুণাবলি নির্ধারণ কর। এরপর একটি পেশার কথা চিন্তা কর যেটি সম্পর্কে তোমরা কিছুটা জানো, যেমন- শিক্ষকতা, ব্যবসায়, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি। দলে বসে চিন্তা করো তোমাদের নির্ধারিত সেই পেশার কোনো মানুষের তালিকায় চিহ্নিত গুণগুলো না থাকলে কী কী অসুবিধা হতে পারে? প্রত্যেক ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা কর।

প্রয়োজনীয় গুণাবলি	**এটি না থাকলে কী কী অসুবিধা হতে পারে?**	**কল্পিত একটি ঘটনা (উদাহরণ হিসেবে)**
১.		
২.		

পেশাগত এ দক্ষতাগুলোর ভিত্তি মূলত ৩টি:

- **মৌলিক দক্ষতা:** শোনা, বলা, পড়া, লেখা ও হিসাব-নিকাশ করতে পারা।
- **চিন্তন দক্ষতা:** সৃজনশীল চিন্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান, প্রয়োজন অনুযায়ী কল্পনা করা, শেখার প্রক্রিয়াটি আয়ত্তকরণ এবং যুক্তি প্রদান ইত্যাদি।
- **ব্যক্তিগত গুণাবলি:** দায়িত্ববোধ, আত্মসম্মানবোধ, সামাজিকতা, আত্ম-ব্যবস্থাপনা, সততা ইত্যাদি।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভের উপায় নিয়ে পোস্টার অঙ্কন

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমাদের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যলাভের জন্য বিভিন্ন গুণ এবং সেগুলো অর্জনের বিভিন্ন উপায় আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ করেছ কি, সেই গুণাবলির কিছু কিছু কর্মক্ষেত্রে সফল হবার জন্যও প্রয়োজন? এবারে এসো আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের উপায় নিয়ে পোস্টার অঙ্কন করব। এজন্য নিচের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করব:

আমরা সবাই দলে ভাগ হয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভের বিভিন্ন উপায়গুলো লিখি।

এবারে প্রতিটি দল তাদের উপায়গুলো ক্লাসের সবাইকে পড়ে শোনাবে এবং প্রত্যেকে গুরুত্বপূর্ণ ৫টি উপায় নির্বাচন করবে পোস্টার অঙ্কনের জন্য।

এবারে দলে বসে প্রত্যেক দল প্রতিটি উপায়ের জন্য একটি করে মোট ৫টি পোস্টার তৈরি করবে। পোস্টারটিতে শিরোনাম, উপায় সম্পর্কে মূলকথা, সেটি সংক্রান্ত ছবি, ছড়া ইত্যাদি থাকতে পারে। প্রত্যেক দল আজ তাদের পোস্টারগুলো প্রদর্শনের জন্য টাঙিয়ে দিবে। প্রত্যেকে ঘুরে ঘুরে পোস্টারগুলো দেখবে, প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দলকে প্রশ্ন করবে।

* কাজগুলোর জন্য মোট চারটি শ্রেণি কার্যক্রম বরাদ্দ করতে হবে।

একটি মডেল পোস্টার

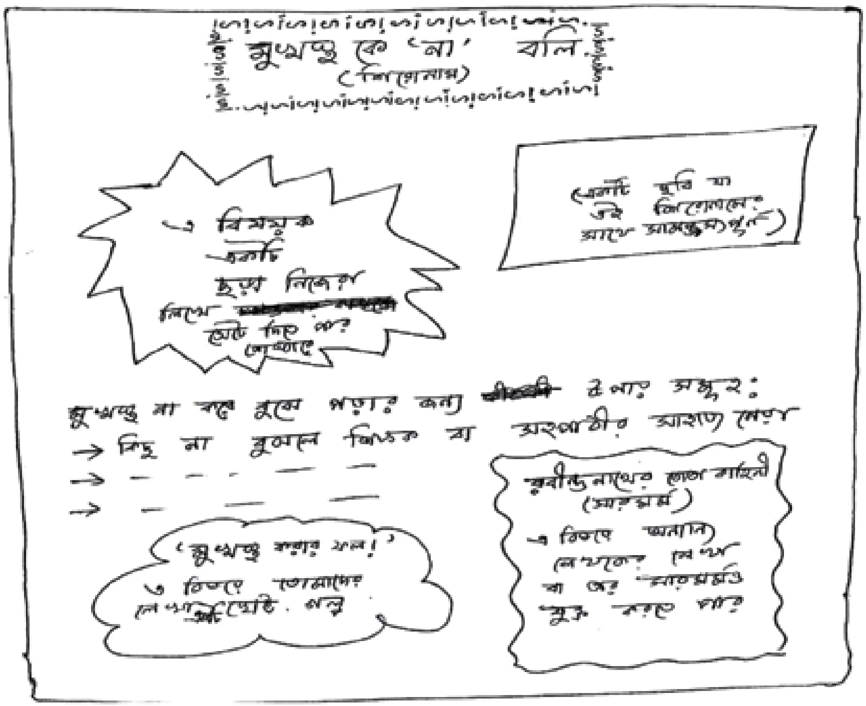

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অষ্টম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীরা কোন পথটি বেছে নিতে পারে?

ক. বিজ্ঞান, মানবিক অথবা ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

খ. চিকিৎসা অথবা প্রকৌশল পেশা

গ. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারা

ঘ. মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা

২. শাখা নির্বাচনের উপর কোনটি নির্ভরশীল?

ক. ভবিষ্যতের পেশা নির্বাচন

খ. পরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়া

গ. মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া বা না দেওয়া

ঘ. বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন

৩. পরীক্ষার কোন ধারাবাহিকতাটি সঠিক?

ক. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী → মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → নিম্নমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট

খ. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী → নিম্নমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট

গ. নিম্নমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী → উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট

ঘ. নিম্নমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী → মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট → উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন-

i. নিজের পছন্দমতো শাখা/ধারা নির্বাচন

ii. ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা

iii. কঠিন বিষয় না বুঝলে মুখস্থ করে ফেলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ii খ. iii

গ. i ও ii ঘ. i. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মিথুন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। তার ইচ্ছা বড়ো হয়ে সে ব্যাংকার হবে। তার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বের হয়েছে। সে বিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে ভালো করেছে। এখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে কোন শাখায় ভর্তি হবে।

ক. শিক্ষা জীবন কী?

খ. শিক্ষার্থীর শাখা নির্বাচনের আগে কোন বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত? ব্যাখ্যা কর।

গ. মিথুনের ভবিষ্যৎ পেশার কথা চিন্তা করলে তার জন্য উপযুক্ত শাখা কোনটি? বর্ণনা কর।

ঘ. মিথুন যদি বিজ্ঞান শাখা নির্বাচন করে তাহলে তার কী সুবিধা বা কী অসুবিধা হতে পারে তা বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম–কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা

গুরুজনকে মান্য করো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।